ক্রিয়ারও ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে কি প্রকারে উহার সুবিধা হইতে পারে? আমরা এই সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত আমাদিগের চক্ষের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও তদ্দ্বারা কি প্রকারে দৃষ্টি ক্রিয়া সমাহিত হয়, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের অক্ষিগোলকের উপরিভাগে যে একটি কৃষ্ণবর্ণ স্বচ্ছ বিন্দু আছে, তাহাকে তারকা বলে। সূর্য্যের আলোক সেই তারকা দিয়া অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরস্থ একটি সূক্ষ্মত্বক্‌ময় আবরণকে স্পর্শ করে। ঐ আবরণের কতগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা আছে। সেই সমস্ত শিরার সাহায্যে ঐ সূক্ষ্মত্বক্‌ময় আবরণ আলোকের শক্তি মস্তিষ্কে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। তখন আমাদিগের বিষয়ানুভ জন্মে। যদি আমাদিগের ঐ সূক্ষ্মত্বক্‌ময় আবরণের অনুভব শক্তি না থাকে এবং উহার যে পরিমাণে আলোক বহন করিবার সামর্থ্য আছে, তদপেক্ষা আলোকের পরিমাণ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে আমরা কখনই বিষয়ানুভব করিতে পারি না। কিন্তু করুণাকর পরমেশ্বর এই উভয়ের কি অদ্ভুত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের এই পৃথিবীতে যে পরিমাণে আলোক নিপতিত হয়, চক্ষের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাহা বহন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্তরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে।

আলোকের আধিক্যই উজ্জ্বলতা গুণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়। আমরা যখন কোন উজ্জ্বল তেজঃ পদার্থ দর্শন করি, যাহার আলোকের আধিক্য আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়কে প্রতিহত করিয়া দেয়, তখন দর্শনেন্দ্রিয় স্বভাবতই সঙ্কুচিত হইয়া চক্ষে প্রতিফলিত আলোক সঙ্কোচ করিয়া আনে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে যেখানে আলোকের আধিক্য, তথায় জীবগণের তারকা এত অল্প প্রশস্ত যে তাহার মধ্য দিয়া আলোকের আধিক্য সত্ত্বেও অল্প আলোক প্রবেশ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা অনায়াসেই দর্শনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সুতরাং বুধ গ্রহে যদি সূর্য্যের সান্নিধ্য-নিবন্ধন আলোকের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে মঙ্গল, শুক্র ও পৃথিবী অপেক্ষা তত্রত্য জীবের তারকা ক্ষুদ্র হইবে। এবং যাহাতে আলোকের অপেক্ষাকৃত অল্পতা আছে, তথায় চক্ষু সমধিক বিস্ফারিত হইবে।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৭১ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠার পর।

বৈদিক কাল নিরূপণ করিতে হইলে এমন কতকগুলি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক, যাহাদিগকে আমরা এই বিষয়ের এক একটি অব্যর্থ প্রমাণ-স্থল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে এক সময়ে ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং যে সমস্ত গ্রন্থ আমাদিগের এই বিষয়ের উপযোগী এবং যে সমস্ত গ্রন্থ অনুপযোগী অগ্রে তাহারই বিচার করা কর্ত্তব্য হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, এক্ষণে যতগুলি গ্রন্থ বীরচরিত-পূর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতই সর্ব্ব-প্রধান। আমরা যখন এই দুই বিস্তীর্ণ গ্রন্থের বিষয় পর্য্যালোচনা করি, তখন ইহার কোন্ কোন্ অংশ প্রাচীন, কোন্ কোন্ অংশ আধুনিক এবং কোন্ কোন্ অংশই বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পর প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হই না। সুতরাং এই দুই গ্রন্থ বৈদিক কাল নিরূপণ করিবার প্রমাণ-স্থল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই যে, রামায়ণ ও মহাভারতে বিস্তর প্রাচীন আ-

খ্যায়িকা ও বেদোক্ত ইতিহাস আছে এবং যাহাদিগের নাম বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, এই দুই গ্রন্থে প্রসঙ্গত তাহাদিগকেও এক এক উপাখ্যানের নায়ক রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। উর্ব্বশী পুরুরবা, শকুন্তলা দুষ্মন্ত, উদ্দালক, শুনঃশেফ, বৈদেহ জনক, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবাল্ক্য, দীর্ঘতমা, কাক্ষীবান প্রভৃতির উপাখ্যান বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই দুই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। যখন বেদোক্ত উপাখ্যানাদি এই দুই গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধ হয়, যে সময় মহাত্মা মহর্ষিগণ ভারতবর্ষীয় বীরগণের চরিত্র গ্রন্থবদ্ধ করেন, তখনও বৈদিক কালের উপাখ্যান সকল অনেকের অভ্যস্ত ছিল; অথবা যখন বীরচরিত-পূর্ণ বৈদিক সূক্ত-সমূহ মহাভারত নামক গ্রন্থ-মধ্যে সঙ্কলন করা হয়, তখন কেহ বৈদিক উপাখ্যানাদি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় নাই। যে সকল আখ্যায়িকা বেদের সূক্ত মধ্যে দৃষ্ট হয় রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ মধ্যে তাহাই সঙ্কলিত দেখা যায়; কিন্তু এই উভয়ের তুলনা করিলে বেদোক্ত আখ্যায়িকা সমূহের রচনা আড়ম্বর-শূন্য আদিম ও বিশদ বলিয়া বোধ হয়। দেবতা ও বীরগণের বল-বীর্য্যের পরিচায়ক পদ্য অন্যান্য আর্য্য বংশীয়দিগের গ্রন্থে যেমন দৃষ্ট হয়, এই ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন কালেও তাহা দৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা যে কেবল রামায়ণ মহাভারতে আছে, তাহা নহে, বেদের মধ্যেও উহার প্রাদুর্ভাব নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। বেদের সূক্ত অনুসন্ধান করিলে বিস্তর বীর-চরিত-চিত্রিত গাথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সমস্ত গাথার কএকটির সহিত হোমরের কএকটি পদ্যের সাদৃশ্য প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের কোন কোন অংশে গাথা, নারশংসী, ইতিহাস ও আখ্যান* এই গুলি বেদের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যখন ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকে এই সমস্ত নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ইতিহাস আখ্যান প্রভৃতি নামে যে সমস্ত গ্রন্থ এক্ষণে প্রথিত আছে, প্রাচীন কালেও উহার অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু যদিও মহাভারতকে ইতিহাস ও রামায়ণকে আখ্যান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় এবং যদিও এক্ষণে অনেকানেক গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া প্রথিত আছে, ব্রাহ্মণভাগে তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই†। বেদের যে যে অংশে দেবতা ও মনুষ্যদিগের উপাখ্যান ও সৃষ্টির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত অংশে যে যে নাম প্রয়োগ করা যায়, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ সেই সেই নাম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,

* ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান গাথা নারশংসীঃ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক। ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি। বৃহদারণ্যক। ইতিহাসশ্চ পুরাণং চ গাথাশ্চ নারশংসীশ্চ। শতপথ ব্রাহ্মণ। সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় আরণ্যকের টীকায় লিখিয়াছেন যে পুরাণ বলিলে ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণ বুঝাইবে এবং ইতিহাস বলিলে মহাভারত বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সায়নাচার্য্যের পূর্ব্ব বাক্যের সহিত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতেছে। তিনি ঋগ্বেদের প্রবেশিকায় লিখিয়াছেন যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ব্রাহ্মণানীতিহাসান প্রভৃতি যে কএকটি নামের উল্লেখ আছে, তৎসমুদায় বেদের অন্তর্গত করিয়া জানিবে, সুতরাং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের টীকায় পুরাণ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণ ও ইতিহাস শব্দে মহাভারতকে নির্দ্দেশ করা তাঁহার নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কাত্যায়নও ইতিহাস পুরাণ শব্দে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থকে গ্রহণ করেন নাই।

† মহর্ষি ব্যাস স্বয়ংই স্বপ্রণীত মহাভারত গ্রন্থকে কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মাও তাঁহার এই গ্রন্থের কাব্য নামই উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমোদন করেন। সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবি সাহিত্য দর্পণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ মধ্যে মহাভারত ও রামায়ণকে মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন স্থলে মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া কার্ষ্ণ বেদ নামে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মাত্র। বস্তুত কি সূত্র কি ব্রাহ্মণ বেদের কোন ভাগেই মহাভারত প্রভৃতি নামের উল্লেখ নাই। আশ্বলায়ন সূত্রের এক স্থলে ভারত এবং ঐ গ্রন্থের কোন কোন হস্ত-লিপিতে মহাভারত এই শব্দটি দেখিতে পাওয়া যায় *। কিন্তু ভারত বা মহাভারত এই শব্দটি একখানি বীর-চরিত্র-পূর্ণ গ্রন্থে আরোপ না করিয়া ঐরূপ গ্রন্থের সাধারণ নাম বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা পরে আশ্বলায়ন সূত্রের উৎপত্তি-কাল নিরূপণ করিব এবং তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদন করা হইবে যে, মহাভারত গ্রন্থ উহার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং আশ্বলায়ন সূত্রে যদিও উহার নাম দৃষ্ট হয়, তাহা তাদৃশ ফলোপধায়ক হইতেছে না। আমরা বর্ত্তমান সময়ে মহাভারতকে যে রূপ দেখিতেছি, উহা পূর্ব্বতন মহর্ষি-গণ দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে। আশ্ব-লায়ন সূত্রের পূর্ব্বে বা উহার সম কালেই হউক মহাভারতের যে পূর্ব্বতন একটি আ-কার ছিল, অনেক অনুসন্ধান করিলেও তা-হাতে উহাকে পুনঃস্থাপন করা এ ক্ষণে নিতান্ত সুকঠিন হইবে। অধ্যাপক লা-সেন স্বপ্রণীত ভারতবর্ষীয়-পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে এমন কতকগুলি বিষয় উদ্ভাবন ক-রিয়াছেন যে তদ্দ্বারা মহাভারতের প্রাচীন অংশ আধুনিক অংশ হইতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। যে সমস্ত পূর্ব্বতন ইতিহাস ও গাথা বর্ত্তমান মহা-ভারত ও রামায়ণে সংকলিত ও সন্নি-বেশিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে জীবন্তভাবে অবস্থিত ছিল, তৎসমু-দায় এ ক্ষণে যদি রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া য-ইতে পারে এবং বৈদিক কাল নিরূপণেরও একটি সুবিধা হয়। কিন্তু আমরা যদি রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ত্তমান আকার, ভাষা, ছন্দ এবং নীতি ও ধর্ম্মপ্রণালী পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, যখন বেদের বিষয়গুলি জন-শ্রুতিতে নীত হইতেছে, যখন উহার মধ্যে কতকগুলি এক কালে বিস্মৃত ও কতকগুলি অযথাভূতরূপে গৃহীত হইয়াছে, সেই সময়ে ঐ সমস্ত গ্রন্থবদ্ধ করা হয়। যাহা মহাভারতের প্রধান অংশ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, সেই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের বিষয় বেদে কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। কুরু ও ভার-তের নাম বেদের স্থানে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় বটে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের নাম উহার কোন স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধিক কি, পাণিনি ব্যাকরণেও কুরু ও ভারতের নাম আছে কিন্তু পাণ্ডু বা পাণ্ডবদিগের নামের উল্লেখ মাত্র নাই। সুতরাং আশ্ব-লায়ন সূত্রকে যদি পাণিনির সমকালীন বা উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলিয়া স্বী-কার করা যায়, তাহা হইলে উহাতে যে ভারত এই শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা দ্বারা যাহাতে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহাভারত কখনই বোধ হইতে পারে না।

আমরা এ ক্ষণে মহাভারতকে যে আ-কারে দেখিতেছি, ইহা পর্য্যালোচনা ক-রিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যাঁহারা এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই সমস্ত মহাকবিদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্মগত

* আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে "ভারতধর্ম্মাচার্য্যাঃ" কোন কোন পুস্তকে "মহাভারতধর্ম্মাচার্য্যাঃ" এই দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু টীকাকার "মহাভারতধর্ম্মাচার্য্যাঃ" এই কথায় কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে, যে, কেহ এই কথাটি মূল গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছে।

ভাব গ্রন্থের নায়কদিগের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাঁহারা মনু-প্রণীত ব্যবস্থা অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ-কুল-প্রসূত কবিদিগের উপদেশের ভাব এই উপাখ্যানের বীররসের বিস্তর ব্যাঘাত করিয়াছে। কিন্তু আমরা যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে পাণ্ডবদিগের আদিম ইতিহাস এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়াছে তাহা দেখিতে পাই। সুতরাং আমরা এ ক্ষণে ইহা সুস্পষ্টই স্বীকার করিতে পারি যে, যে জাতির মধ্যে মহাভারতের পাঁচ জন প্রধান নায়ক সম্ভূত ও প্রতিপালিত হইয়াছেন, সেই জাতি ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্র ব্যবস্থার আধিপত্য কালের পূর্ব্বে অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। ইহা কি কখন সম্ভব হয় যে, যে পাণ্ডবেরা বর্ত্তমান মহাভারত গ্রন্থে বেদ ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ ও স্মৃতি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্র-ব্যবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক একটি স্ত্রী ভ্রাতৃসাধারণ-ভোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? বেদে কথিত আছে এক ব্যক্তি বহু দার পরিগ্রহ করিতে পারে কিন্তু একটি স্ত্রীর অনেক পতি হয় এরূপ নাই অসঙ্গত *। সুতরাং মহাভারত গ্রন্থে পঞ্চপাণ্ডবের যে একমাত্র ভার্য্যা তাহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সময়ে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তৎকালে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের বৃত্তান্ত লোকের হৃদয়ে এত জাগরূক ছিল যে এই রূপ ব্যবহারগত শাস্ত্রীয় বিরোধটি কবিগণকে অগত্যা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। যখন গ্রন্থকারেরা দেখিলেন যে এই বিরোধটি কোন ক্রমেই অতিক্রম করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা উক্ত ব্যবহারে এই রূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন যে শাস্ত্র-বিরোধী বলিয়া আপাতত উহাতে কেহ দোষারোপ করিতে পারিবেন না। তাঁহারা গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগে লিখিয়াছেন যে ভীম ও অর্জ্জুন ভার্গব-কর্ম্মশালায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জননীর নিকট গমন করিয়া হৃষ্ট মনে কহিলেন মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে। তাঁহাদিগের জননী কুটীরের অভ্যন্তরে ছিলেন; তিনি পুত্রকে না দেখিয়াই কহিলেন, বৎসগণ! তোমরা যে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, তাহা সকলে মিলিত হইয়া ভোগ কর *। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে পিতামাতার বাক্য প্রতিপালন করা পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং পঞ্চ পাণ্ডবদিগকে শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া রমণীরত্ন দ্রৌপদীকে ভ্রাতৃ সাধারণের ভার্য্যা বলিয়া প্রতিগ্রহ করিতে হইল। স্মৃতি শাস্ত্র-কারেরা এই রূপ ব্যবহারকে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন †। যদিও তাঁহারা কৌশলে

* যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দতে যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে। — (বেদেহপ্যেবং শ্রূয়তে একস্য বহ্ব্যো জায়া ভবন্তি নৈকস্যা এব বহবঃ পতয়ঃ সন্তি।)

* গত্বাতু তাং ভার্গবকর্ম্মশালাং পার্থৌ পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ। তাং যাজ্ঞসেনীং পরমং প্রতীতৌ ভিক্ষেত্যথাবেদয়তাং নরাগ্র্যৌ। কুটীগতা সাত্বনবেক্ষ্য পুত্রৌ প্রোবাচ ভুঙ্ক্তেতি সমেত্য সর্ব্বে। মহাভারত আদিপর্ব্বান্তর্গত স্বয়ম্বর পর্ব্ব।

† ধর্ম্মো দ্বিবিধঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ। মন্দমতিভিরপি সুখেন বুধ্যমানঃ সশৌচাচমনসন্ধ্যাবন্দনাদিঃ স্থূলো ধর্ম্মঃ। শাস্ত্রপারংগতৈঃ পণ্ডিতৈরেব বোদ্ধুং যোগ্য ইতরেষামধর্ম্মভ্রান্তিবিষয়ো দ্রৌপদীবিবাহাদিঃ সূক্ষ্মো ধর্ম্মঃ। পরাশর সংহিতার সায়নাচার্য্য কৃত টীকা।

ধর্ম্ম দুই প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম। শৌচাচমন সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি যে সকল বিষয় মূর্খেরাও অনায়াসে বুঝিতে পারে, তাহার নাম স্থূল ধর্ম্ম।

দ্রৌপদী-বিবাহ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ধর্ম্ম শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন কিন্তু মূঢ়দিগের তদ্বিষয়ে অধর্ম্ম ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।

যৌবনস্থৈব কৃষ্ণাহি বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা। সাচ শ্রীশ্চ ভুজ্যমানাপি ভূয়ো ভূয়ো ন দুষ্যতি।

দ্রৌপদী যৌবন সম্পন্না হইয়াই বেদি মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপ, লক্ষ্মী অনেকের ভোগ্য হইলে কদাচই দূষিত হন না।

ইহার শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন কিন্তু কোন স্থানেই ইহাকে সাধারণ-নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই।

পাণ্ডু ধর্ম্মানুসারে দুইটি স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাও আবার ব্যবস্থা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়াছে। বহু বিবাহ শাস্ত্রের অননুমোদিত নহে, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন যে, দুই বা বহু পত্নীর পাণিগ্রহণ ধর্ম্ম্য হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী লোকান্তরিত পতির সহিত চিতাধিরোহণ করিতে পারিবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্ব কালের উপাখ্যান জনশ্রুতিতে অব্যাহত হইয়া আসিতেছিল, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তারা কৌশলে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই। এই বহুবিবাহ অতি প্রাচীন কালে যে কেবল ভারতবর্ষেই ইতর সাধারণ সকলের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহা নহে। আমরা সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসরচয়িতা মহাত্মা হিরোডোটসের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, পূর্ব্ব কালে গ্রীশ দেশে থ্রেসীয় জাতির মধ্যে এই রূপ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং যে রমণী স্বামীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রণয়িনী হইত স্বামীর সমাধির সহিত তাহারও সমাধি হইত। মহাত্মা মেলা গেটী জাতীয়দিগের এই রূপ ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সীদিয়, পরেনিয় ও টিউটন জাতিদিগের মধ্যেও এই প্রণালী অনুসৃত হইত। মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে প্রিয় মহিষী মাদ্রী তাঁহার অনুমৃতা হইয়া ভর্ত্তৃলোকে গমন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠা কুন্তী তদ্বিষয়ে এক কালে বঞ্চিত হন। মহাভারতে এই পরম্পরাগত প্রাচীন উপাখ্যানের বিধিবিরোধিতা দৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু অনেক জাতিতে অনেক কাল এই ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা মহাভারতের ন্যায় রামায়ণেও দেখিতে পাই যে গ্রন্থকার পূর্ব্বপরম্পরা-প্রচলিত উপাখ্যানের স্থানে স্থানে অবৈধ ব্যবহার দর্শন করিয়া তৎকাল-দৃষ্ট ব্যবস্থানুসারে তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। রামায়ণে এক স্থলে বর্ণিত আছে যে, রাজা দশরথ মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃগভ্রান্তিতে একটি ব্রাহ্মণ-কুমারকে বধ করেন। এই পাপ কার্য্যটি ব্রাহ্মণদিগের চক্ষে এমনি গুরুতর বোধ হইত যে এই পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতেন *। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা পূর্ব্বপরম্পরা-প্রচলিত উপাখ্যান রূপান্তরিত না করিয়া কৌশলে লিখিয়াছেন যে ঐ ব্রাহ্মণকুমার রাজা দশরথকে সন্নিহিত দেখিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বধ-পাতক-ভয় হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত কহিলেন, মহারাজ! আমি শূদ্রাগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমরা আরও দেখিতে পাই যে ক্ষত্রিয়কুমার রামের ভুজবলে পরশুরামের পরাজয় নিতান্ত গর্হিত বিবেচনা করিয়া পরশুরামকে ক্ষত্রিয়াতনয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পৃথিবী ও মনুষ্য।

২৭৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬৬ পৃষ্ঠার পর।

আমরা যখন উন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করি, উন্নতিশীল পদার্থ মাত্রেরই উন্নতি যে একই নিয়মের অধীন প্রতিপদেই তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। যখন ভৌতিক জ-

---

* ন ব্রাহ্মণবধাৎ ভূয়ানধর্ম্মো বিদ্যতে ভুবি। তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥ মনু ৮ অধ্যায়। ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা পৃথিবীতে অধিক পাপ আর কিছুই নাই; অতএব রাজা ব্রহ্মহত্যাকে মনেও স্থান দিবেন না।

গতে প্রবেশ করি, দেখিতে পাই যে, দুইটি বিভিন্ন পদার্থের সমবায় না হইলে এবং ঐ দুইটি পদার্থ পরস্পর পরস্পরের সহকারিতা না করিলে কদাচই একটি নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া ভৌতিক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় না। ভুততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিযোগরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা এ ক্ষণে পঁয়ষট্টি মহাভুতের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর আরও যে কত মহাভুতের সৃষ্টি করিয়াছেন অদ্যাপি তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। এই সমস্ত মহাভুতের সমবায় এবং ইহাদের পরস্পরের সহযোগিতা দ্বারা জীবলোকের উপযোগী বিবিধ বস্তু উৎপন্ন হইতেছে। আমরা জল আলোক প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু প্রতিনিয়ত ব্যবহার করিয়া থাকি, তৎ সমুদায় কতকগুলি আদিম উপাদানের রচনামাত্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্য নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া ঐ সমস্ত আদিম উপাদান প্রতিদিন আমাদিগকে নানাবিধ ব্যবহার্য্য দ্রব্য উপহার প্রদান করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। জলেতে দুইটি মাত্র বাষ্প আছে। একটি হাইড্রজন আর একটি অক্সিজন। এই দুই বাষ্পের গুণ স্বতন্ত্র, কিন্তু এই উভয়বিধ বাষ্প যখন মিলিত ও কার্য্য-সূত্রে বদ্ধ হয়, তখন আর ইহাদের স্বতন্ত্র-ভাব প্রত্যক্ষ হয় না। ইহারা উভয়ে যেন সখ্য ভাবে আর্দ্র হইয়াই সলিলরূপে পরিণত হয়। যে দুই বস্তু এত ক্ষণ আমাদের অপ্রত্যক্ষ ছিল তাহারা এ ক্ষণে রূপান্তরিত ও নিরীক্ষিত হইল এবং ইহাদের পূর্ব্বের গুণ আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। এই দুই বাষ্প যে কেবল এক কার্য্যেরই উপযোগী তাহা নহে। উহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার পদার্থ উৎপাদন করিয়া থাকে। আবার এই সমস্ত বাষ্পের সহযোগে যে সকল পদার্থ প্রস্তুত হইল, তাহারাও অন্য পদার্থের সাহায্যে নানা প্রকার বস্তু উৎপাদন করিতেছে। এই রূপে ভৌতিক রাজ্যের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বাষ্প সহযোগে যে সমস্ত ঘটনা উৎপন্ন হয় তাহা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও দুর্লক্ষ্য, কিন্তু ধাতু দ্বারা যে রূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। একটি তাম্র ও আর একটি দস্তা এই দুইটি ধাতু পরস্পর পরস্পরকে নিকটে পাইলে তাড়িতাগ্নির উৎপত্তি হইবে। আবার যদি এই দুই ধাতুকে সমান রূপে উত্তপ্ত না করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের পার্শ্বে রাখ, দেখিতে পাইবে যে, তাড়িতাগ্নি ও উত্তাপ পরস্পর পরস্পরের নিকট গ্রহণ করিতেছে। এই দুই ধাতুর সংস্থান, পরিমাণ ও উত্তাপ বিভিন্ন প্রকার হইলেও উহাদের হইতে ঐ রূপ কার্য্য অবশ্যই ঘটিবে। জীব-দেহ যে নির্ম্মিত হয়, তাহা ও এই রূপ প্রক্রিয়ার অধীন।

ইন্দ্রিয়ের আধিক্যই উন্নতির কারণ। যাহার যে পরিমাণে ইন্দ্রিয় আছে, তাহার উন্নতি তদনুরূপ হইবে। আমরা ইতর জন্তুদিগের সহিত মনুষ্যের তুলনা করিলে এই বিষয় সুস্পষ্ট অবগত হইতে পারি। অন্যান্য জন্তুর কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রায় মনুষ্যদিগের তুল্য কিন্তু উহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাব আছে। মনুষ্যের যে সামাজিক উন্নতি আছে এবং পশুরা যে তাহার আস্বাদনে এক কালে পরাঙ্মুখ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাবই তাহার অদ্বিতীয় কারণ। এই সামাজিক উন্নতি সাধারণ-উন্নতির নিয়ম দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। দুইটি বিষম পদার্থের পরস্পর সংযোগ দ্বারা যেমন জড় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, মনুষ্যের সামাজিক উন্নতিও সেই রূপ।

এস্থলে আমারা দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন মনুষ্যের সমবেত কার্য্য দ্বারা সামাজিক উন্নতি হইতেছে। বিভিন্ন বাষ্প কার্য্য সাধন কালে বিভিন্ন ভাব-শূন্য না হইলে যেমন সলিলাকারে পরিণত হয় না. সেই রূপ সামাজিক উন্নতি-কালে সমাজের প্রায় সাধারণ মনুষ্যের ভাব এক রূপ না হইলে একটি নূতন সৃষ্টি হয় না। এই রূপ উন্নতির নিয়ম থাকাতেই সংসারের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। যদি কার্য্য-কালে প্রত্যেকের ভাব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকে, তাহা হইলে আমরা কদাচই এই রূপ উন্নতি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম না। জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর এই জন্যই উন্নতির নিয়ম এই রূপ বিধান করিয়া দিয়াছেন। আমরা ইহা দ্বারা কেবল তাঁহারই অচিন্ত্য ও অননুমেয় জ্ঞানের সম্যক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কারণস্য কারণং বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি।

প্রেরিত পত্রের উত্তর।

ওঁ তৎসৎ।

বোলপুর—শান্তি-নিকেতন।

১৩ কার্ত্তিক ১৭৮৮ শক।

পরম কল্যাণাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মিত্র মহাশয় সমীপেষু
এলাহাবাদ

আদর-ভাজনেষু—

পরমশুভাশিষাং রাশয়ঃসন্তু।

তোমার ১২ শ্রাবণের পত্র পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে কতিপয় বন্ধুবর্গের সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক খানি পাঠ করিতেছিলাম। ইহা হইতে আমার নিকটে শুভ সংবাদ আর কি আছে? ঈশ্বর তোমার জ্ঞান উজ্জ্বল করিয়া তাহাতে আপনার সত্য-রূপ অমৃত-রূপ প্রকাশ করুন এবং তোমার হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগ বৃদ্ধি করুন, এই আমার প্রার্থনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্রুতিতে তোমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিরাকরণের জন্যে আমার উপরে যে ভারার্পণ করিয়াছ; তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম—ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্য কিসের উপর নির্ভর করে, তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য-সকল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। সেই সকল সত্যের আলোক মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টিতেই পতিত হয়। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম ছিল এবং এ সকল যদিও একেবারে ধ্বংশ হয়,তথাপি তাহা থাকিবে। মনুষ্যের আত্মার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি, এই হেতু ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ-বিশেষে, বা ব্যাস চৈতন্য ঈসা মুসা প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম আবদ্ধ নহে—ইহা উন্নতিশীল আত্মার উন্নতিশীল ধর্ম্ম। যে আত্মা যত উন্নত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ভাব তাহার নিকটে তত প্রকাশ পাইবে। এই হেতু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম শ্রুতির তাৎপর্য্যে এই প্রকার সূত্রপাত করা গিয়াছে যে "ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্যে দেশ-বিশেষ, কি কাল-বিশেষ, কি জাতি-বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদীদিগেরই উপদেশ দিবার অধিকার আছে।" কিন্তু অন্যান্য দেশের অন্যান্য ব্রহ্মবাদীদিগের উপদেশ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নাই এবং এখানকার দর্শনকারদিগেরও সিদ্ধান্ত-সকল ইহাতে সন্নিবেশিত করা হয় নাই। প্রত্যুত ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্ম-বিষয়ে যে সকল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। সমুদয় বেদ ঋষিবাক্য—তাহার মধ্যে উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ের উপদেশ আছে। সেই সকল উপনিষদের মধ্যে যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ বাক্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংগত যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের

প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। এখন, বোধ হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের সংকলনের সংকল্প কি তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছ।

এই সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা-অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের সপ্তমাধ্যায়ে এই শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে যে " ন বভূব কশ্চিৎ " আপনি কিছুই হন নাই। ইহা কঠ ঋষির সহজ বাক্য। বেদান্তদর্শনকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আসিয়া আপনার বুদ্ধি-কৌশলে এই সহজ সত্য হইতে এই অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন যে যখন ঈশ্বর আপনি কিছুই হন নাই, তখন এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ সংসারও কিছুই হয় নাই—এ সকলই ভ্রম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে কাহার এ ভ্রম? যদি এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই, তবে ইহা ঈশ্বরেরই ভ্রম। ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ঈশ্বরের ভ্রম—একি বিষম কথা! অথচ দর্শনকারেরা ঈশ্বরের ভ্রম অঙ্গীকার না করিয়া আর আপনারদের অদ্বৈত পক্ষ রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব এই শ্রুতিটির তাৎপর্য্য স্পষ্ট করিয়া সকলকে বুঝান গিয়াছে যে "জন্ম-মৃত্যু-বিকার-বিহীন, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ পরমাত্মা হইতে এই সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনি কিছুই হয়েন নাই, দুগ্ধ পরিণত হইয়া যেমন দধি হয়, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া যেমন ঘট হয়, এবং স্বর্ণ অবস্থান্তর হইয়া যেমন কুণ্ডল হয়, তিনি সে রূপ কোন বস্তু-রূপে পরিণত হয়েন নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জল ভ্রম হয়, এবং শুক্তিকায় যেমন রজত ভ্রম হয়, তাঁহাতে সে রূপ ভ্রম হইয়া যে এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও নহে। তিনি এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ। তিনি স্বয়ং জড়ও হন নাই, এবং জীবও হন নাই। তিনি সেব্য ও উপাস্য, এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবক ও উপাসক।"

তোমার পত্রে সদানন্দ যোগীন্দ্র-প্রণীত বেদান্তসারের কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা অদ্বৈতবাদীদিগেরই সিদ্ধান্ত *। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন শাস্ত্রের যোলটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত ছিল, তন্মধ্যে ছয় দর্শন অদ্যাপি সকলেরই নিকটে প্রসিদ্ধ আছে। এই বিবিধ দর্শনের এক প্রকার মত নহে। সকলেই পরস্পরের মতে দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন। এই সমুদায় দর্শনের মধ্যে একটির নাম শাঙ্কর দর্শন। এই দর্শনই এ দেশে বেদান্ত-দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় এই বেদান্ত-দর্শনের মত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে সকল শারীরক সূত্র অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, রামানুজাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতেই দ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতেরা বিবিধ দর্শনকারদিগের বিবিধ প্রকার মতে বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "দর্শনস্য দর্শনেন নো মনো হি নির্ম্মলং।" দর্শন-শাস্ত্রের দর্শন দ্বারা মন নির্ম্মল হয় না। দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে নানা প্রকার মত অবগত হওয়া যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ মতটি যে সত্য তাহা নিরূপণ করা যায় না। এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া এই উপদেশ দেন যে আধ্যাত্মিক সত্য জানিতে হইলে আপনার আত্মাতে দৃষ্টি করিতে হইবে, আপনার আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যে সকল সত্যে আমারদের আত্মা নিঃসংশয় হইয়া সায় দেয়, সেই সকল সত্যই আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। যথা—এই জগৎ আছে, আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, এই সকল সত্য আত্ম-প্রত্যয়-মূলক, আমার আত্মা ইহা না বিশ্বাস করিয়া থাকিতে পারে না। সত্য-ব্যবহার করিবে, ন্যায়-ব্যবহার করিবে—ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে, পুত্র কন্যাকে স্নেহ করিবে, দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবে; এ সকল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ নীতি উপদেশ। মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গল নাই—বিপদ্ সম্পদ উভয়ই আমারদের আত্মার উন্নতি ও মঙ্গলের হেতু ইহা আত্ম-প্রত্যয় রূপ শ্রদ্ধা। এই শরীরের নাশে আমারদের আত্মার বিনাশ নাই; কিন্তু এই আত্মা চিরকাল ঈশ্বরের রাজ্যে থাকিয়া অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে থাকিবেন; এই

* অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ। অপবাদঃ নাম? রজ্জু বিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববৎ বস্তুবিবর্ত্তস্যাবস্তুনোঽজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বং। বস্তু? সচ্চিদানন্দ মদ্বয় ব্রহ্ম। তদুক্তং, সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃত ইতি।

আমারদের আধ্যাত্মিক আশা। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যকে অবলম্বন করিয়া সৎ-পথে জ্ঞান-পথে ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হও—সত্য স্বরূপ ঈশ্বর তোমারদের নিকট প্রকাশিত হইবেন ইতি।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

নূতন পুস্তক।

জ্ঞানামৃত। এই পুস্তক পরমার্থসার আত্মবোধ ও প্রশ্নোত্তরমালা নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ইহা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও বর্দ্ধমান দ্বিজরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বেদান্ত দর্শনেরই ছায়া। সংসারে অনাসক্ত ও ঈশ্বরে জগৎভ্রম প্রভৃতি বেদান্ত দর্শনের মত। এক্ষণে এই মতের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রতিমাসে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে যে সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হইতেছে, স্থায়ী হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারিবে।

নবপ্রবন্ধ। ইহাও একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার বিষয়গুলি উত্তম হইয়াছে। দীর্ঘজীবী হইলে ইহা দ্বারাও সমাজের শুভোদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

অবলা চরিত। ইহা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ফিনিসিয়া হিমেন্স, হানামোর প্রভৃতি আটটি সুবিখ্যাত রমণীর জীবন-চরিত আছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম।

কাব্যমঞ্জরী। ইহা গ্রন্থের প্রথম ভাগ মাত্র। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভারত ভূমি, প্রভাত, সন্ধ্যা ও রাত্রি প্রভৃতি চতুর্দ্দশটি বিষয় বর্ণিত আছে। আমরা ইহা পাঠ করিয়া দেখিলাম, গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বিলক্ষণ কবিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসাধন।

ইহাই সমস্ত সাধনের ফল। ইহাই মানবজীবনের শেষ লাভ। এই রূপ হইলেই মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। যখন আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তখন সে একান্ত নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হয়; তাহার সকল আশা, সকল কামনা পূর্ণ হয়; তাহার সমুদায় বৃত্তি চরিতার্থ হয়। এ অবস্থাতে সাধক আত্মকাম ও সিদ্ধসংকল্প হইয়া ব্রহ্মের সহিত নিরন্তর অবস্থিতি করেন। এইরূপ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ব্রহ্মসাধন হইল।

যে কয়েকটী সোপান পরম্পরায় উত্থিত হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা উপরে উল্লিখিত হইল। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে সাধনের কার্য্য সকল বিমিশ্র ভাবে কিম্বা অন্য প্রকারে সাধকের মনে ঘটিতে পারে। মনুষ্যের স্বাধীন আত্মা সাধন করিবে, সেই স্বতন্ত্র পুরুষ তাহাকে সিদ্ধি দান করিবেন; সুতরাং সাধক যে কত প্রকারে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন! কোন ব্যক্তি হয়ত একবারেই তাঁহার সহচর ও অনুচর হয়েন, কোন কোন ব্যক্তিকে হয়ত অল্পমাত্র সাধন করিতে হয়, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির সম্বন্ধে সেরূপ ঘটে না। বাল্যকাল হইতে বহির্বিষয়ে মনকে সর্ব্বদা সঞ্চালন করিয়া অনেকে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া পড়ে। বাহ্য বিষয়ের চিন্তা করাই তাহাদের একমাত্র অভ্যাস। তাহাদিগের পক্ষেই সাধনের প্রয়োজন।

ঈশ্বরের সাধকের কতকগুলি লক্ষণ আছে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে অন্য লোক হইতে বিলক্ষণ প্রভেদ করা যায়।

ঈশ্বরের সাধক যিনি তিনি অকপট ও ঋজু স্বভাব। তিনি লোকরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ঈশ্বরের সত্য পালনের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। সাংসারিক কুটিলতা ও কপটতা তাঁহাতে কিছুই নাই। তিনি ধর্ম্মপালনের নিমিত্ত লোকের সহযোগিতার অপেক্ষা করেন না। তিনি এই মাত্র জানেন যে আপনার যাহা কিছু হউক ঈশ্বরের সত্য পালন করিতেই হইবে। পরম

পিতার সত্য পালনই তাঁহার দৃঢ় ব্রত। তাহাতে তাঁহার শ্রান্তি নাই, আলস্য নাই, তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহার সত্তার অনুসরণ করেন। একটু অসত্য বা একটু কপটতা তাঁহার নিকট মহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। যাহাতে মিথ্যাচরণের সম্ভাবনা মাত্র আছে, এরূপ কার্য্যে তিনি পদক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। ফলতঃ সত্য তাঁহার অন্নপান, সত্যই তাঁহার বল, সত্য পালনই তাঁহার চির ব্রত। তাহাতেই তাঁহার আনন্দ এবং তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি। এরূপ মহাশয় ব্যক্তিকে সকলেই ভক্তি করে; তিনি বিপক্ষপক্ষেরও পূজনীয় হয়েন।

ঈশ্বরের সাধক বিনম্র ও উদার স্বভাব। তিনি আধ্যাত্মিক মদশূন্য। তিনি আপনার অপূর্ণতা বিলক্ষণ রূপ উপলব্ধি করেন। তাঁহার নিকটে তাঁহার নিজের জ্ঞান ও শক্তি অতি সঙ্কীর্ণ বোধ হয়। তিনি সকল লোককে স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন ও সকলের সহিত বিনীত ভাবে ব্যবহার করেন। তিনি এই জগতের লোকের মধ্যে নানা প্রকার বৈষম্য ভাব দৃষ্টি করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রাতৃভাবের ব্যত্যয় হয় না। তিনি নানা প্রকার সম্প্রদায়ের লোককে ও নানা প্রকার অবস্থাপন্ন লোককে সমান ভ্রাতৃভাবে স্নেহ করেন। তিনি জানেন যে ধার্ম্মিকদিগের মধ্যেও নানা মত বৈষম্য উপস্থিত হইতে পারে, কেন না সকল লোকের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি সমান নহে, আর তাঁহাদিগের মধ্যে কার্য্য বৈষম্যও হইতে পারে, তাহার কারণ এই যে অপূর্ণতা হেতু মনুষ্য তাহার মনোবৃত্তি গুলিকে সর্ব্বসামঞ্জসীভূতরূপে চালনা করিতে পারে না। কেহ স্বভাবতঃ ঈশ্বর প্রীতির দিকে, কেহবা স্বভাবতঃ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের দিকে চলিয়া পড়েন। কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের এই মত-বৈষম্য অথবা কার্য্যবৈষম্য তাহার উদারতা খর্ব্ব করিতে পারে না। তিনি সকল প্রকার ধার্ম্মিক লোকের প্রতি সস্নেহ ভাবে দৃষ্টি করেন এবং সকলেরই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। তিনি পাপী ব্যক্তিকেও ঘৃণা করেন না। তিনি নিশ্চয় জানেন যে এমন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি নাই যে সম্পূর্ণরূপে দোষ শূন্য এবং এমন কোন পাপী ব্যক্তি নাই যে সম্পূর্ণরূপে গুণ শূন্য। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেমন সম্পূর্ণরূপ সৌন্দর্য্য বিবর্জ্জিত নহে, তেমনি ঈশ্বর যে পাপী ব্যক্তির আত্মাকেও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহার চিহ্ন সে আত্মা প্রকাশ করে। অতএব তিনি পাপী ব্যক্তির নিকট হইতেও কোন কোন বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিতে ঘৃণা করেন না।

দুর্ভিক্ষ উপশমের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্ত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৬৯৪
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সিংহ-জব্বলপুর..	৪
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ	১০
	১৪
	৭০৮

দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত দশে প্রেরিত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৫৫০
স্থিত	১৫৮

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের
১৭৮৮ শকের কার্ত্তিক মাসের
আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৮৸০
পুস্তকালয়	৪৩৷৴১৫
যন্ত্রালয়	২৪
ডাক মাসুল	৬৸০
অনিরূপিত	২ ⁄১০
দুর্ভিক্ষ	১৪
গচ্ছিত	২৪ ৷⁄১০
	১৬৩৸১৫

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৪
যন্ত্রালয়	৪৩
অনিরূপিত	২৫৷⁄১০
আলোকের ব্যয়	২৪
গচ্ছিত	৮৸⁄১৫
	১২৫৷⁄৫

আয়	১৬৩৸১৫	
পূর্ব্বকার স্থিত	২৭৯	
		৪৪২৸১৫
ব্যয়		১২৫৷⁄৫
স্থিত		৩১৭৴১০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ২৩ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
পৌষ ১৭৮৮ শক
২৮১ সংখ্যা
৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য ত্রয়োদশানুবাকে একাদশং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

৯০০

১৬। কো অদ্য যুংক্তেধুরি গা ঋতস্য শিমীবতো ভামিনো দুর্হৃণায়ূন্। আসন্নিষূন্‌হৃৎস্বসো ময়োভূন্য এষাং ভৃত্যামৃণধৎ স জীবাৎ।

১৬। 'অদ্য' অস্মিন্ কর্ম্মণি 'ঋতস্য' গন্তুতঃ ইন্দ্রসম্বন্ধিনঃ রথস্য 'ধুরি' অশ্ববহনপ্রদেশে 'গাঃ' গতিমতঃ অশ্বান্ 'কঃ' 'যুঙ্ক্তে' কোনাম নিযোক্তুং শক্নোতি নকোপীত্যর্থঃ। কীদৃশান্ অশ্বান্ 'শিমীবতঃ' বীর্য্যকর্ম্মোপেতান্ 'ভামিনঃ' তেজসা যুক্তান্ 'দুর্হৃণায়ূন্' পরৈর্দুঃসহেন ক্রোধেন যুক্তান্। হৃণীয়তিঃ ক্রুধ্যতিকর্ম্মা। 'আসন্নিষূন্' যেষাং আসনি আস্যে মুখপ্রদেশে শত্রূণাং প্রহরণার্থং ইষবো বাণাবদ্ধাস্তান্। 'হৃৎস্বসঃ' হৃৎসু শত্রূণাং হৃদয়েষু অস্যন্তি স্বকীয়ং পাদং ক্ষিপন্তীতি হৃৎস্বসঃ। 'ময়োভূন্' ময়সঃ সুখস্য ভাবয়িতৄন্ স্বকীয়ানাং সুখপ্রদান্ ইত্যর্থঃ। 'যঃ' যজমানঃ'এষাং' ঈদৃশানাং অশ্বানাং'ভৃত্যাং' ভরণক্রিয়াং রথবাহনক্রিয়াং 'ঋণধৎ' সমর্দ্ধয়তি স্তৌতীতি যাবৎ 'সঃ' যজমানঃ 'জীবাৎ' জীবনবান্ ভবেৎ।

১৬। অদ্য কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের এই গমনশীল রথের ধুর-কাষ্ঠে বেগ-গামী অশ্বগণকে যোজিত করিতে সমর্থ হইবে। এই সকল অশ্ব বীর-কর্ম্মা, তেজস্বী ও দুঃসহ-ক্রোধ-সম্পন্ন। ইহাদের মুখে শত্রুর প্রতি প্রহারার্থ শর-সমুদায় বদ্ধ রহিয়াছে এবং ইহারা শত্রুগণের বক্ষঃস্থলে পাদ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। যিনি এই সমস্ত সুখপ্রদ অশ্বগণের রথবাহন কার্য্যের স্তব করেন, তিনি জীবন লাভে সমর্থ হন।

৯০১

১৭। ক ঈষতে তুজ্যতে কো বিভায় কো মংসতে সন্তমিন্দ্রং কো অন্তি। কস্তোকায় ক ইভায়োত রায়েঽধি ব্রবত্তন্বেঽকো জনায়।

১৭। অনুগ্রহীতরি ইন্দ্রে আগতে সতি 'কঃ' 'ঈষতে' শত্রোর্ভীতঃ সন্ কোনির্গচ্ছতি ন কোপি ইত্যর্থঃ। 'কঃ' 'তুজ্যতে' কো হিংস্যতে শত্রুভির্হিংসোপি কশ্চিন্নাস্তি ইত্যর্থঃ। 'কঃ' যজমানঃ 'বিভায়' বিভেতি, ইন্দ্রে রক্ষকে সতি ভয়মপি নোৎপদ্যতে দূরে তস্য শত্রুকৃতা হিংসা। 'অন্তি' অন্তিকে সমীপে 'সন্তং' অস্মাকং রক্ষকত্বেন বর্ত্তমানং 'ইন্দ্রং' 'কঃ' পুরুষঃ 'মংসতে' জানাতি বয়মেব জানীমোনান্যঃ ইত্যর্থঃ। একঃ কঃ পূরকঃ। যুক্তে সহা-

র্থার্থং ইন্দ্রে আগতে সতি 'কঃ' যজমানঃ 'তোকায়' পুত্রায় 'অধিব্রবৎ' হে ইন্দ্রাস্মদীয়ং পুত্রং রক্ষেত্যেবং রূপং অধিবচনং পক্ষপাতেন বচনং ব্রাহ্মণাদ্যধিক্রমাৎ ইতি যথা এবং রূপং অধিবচনং কো যজমানঃ কুর্য্যাৎ স্বয়মেবেন্দ্রো রক্ষতীতি ভাবঃ। 'ইভায়' গজায় 'কঃ' অধিব্রবৎ 'উত' অপিচ 'রায়ে' শত্রুভিঃ অপহ্রিয়মাণায় ধনায় কঃ অধিব্রবৎ অপহ্রিয়মাণং অস্মদীয়ং ধনং রক্ষ ইত্যধিবচনমপি কো যজমানঃ কুর্য্যাৎ ন কোপি ইত্যর্থঃ। অপিচ 'তন্বে' স্বকীয়ায় শরীরায় 'জনায়' পরিজনায় চ 'কঃ' অধিব্রবৎ স্বশরীররক্ষার্থং পরিজনরক্ষার্থং চেন্দ্রস্য অধিবচনং নাপেক্ষিতং স্তুত্যা প্রীতইন্দ্রঃ স্বয়মেব রক্ষতীত্যর্থঃ।

১৭। ইন্দ্র আগমন করিলে শত্রু-ভয়ে ভীত হইয়া কোন্ ব্যক্তি পলায়ন করে এবং কে হিংসিত ও কেই বা ভীত হইয়া থাকে? আমাদের রক্ষার্থ সন্নিহিত ইন্দ্রকে আর কে জানিতে পারে? ইহাঁর নিকট কাহাকে পুত্রের রক্ষা-বিধানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে হয়? হস্তীর নিমিত্ত কে প্রার্থনা করে এবং কেইবা আপনার ও পরিজনের রক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া থাকে? ইনি প্রীত হইয়া স্বয়ংই যজমানের সমুদায় রক্ষা করেন।

৯০২

১৮। কো অগ্নি মীট্টে হুবিষা ঘৃতেন স্রুচা যজাতা ঋতুভির্ধ্রুবেভিঃ। কস্মৈ দেবা আ বহানাশু হোম কো মংসতে বীতিহোত্রঃ সুদেবঃ।

১৮। 'কঃ' যজমানঃ 'অগ্নিং' 'ঈট্টে' ইন্দ্রার্থং হবির্নিরূপ্য অগ্নিং স্তৌতি ইন্দ্রায় হবির্নির্ব্বাপোহপি সম্যক্‌কর্ত্তুং ন শক্যতে ইন্দ্রস্য দুর্ব্বিজ্ঞানত্বাৎ। কো বা ইন্দ্রযাগার্থং অগ্নিং 'স্রুচা' জুহ্বা 'ধ্রুবেভিঃ' ধ্রুবৈঃ নিত্যৈঃ ঋতুভিঃ বসন্তাদিকালৈঃ উপলক্ষিতেন 'ঘৃতেন' 'হবিষা' 'যজাতৈ' যজেৎ। যথা ঋতবঃ প্রযাজদেবতাঃ। ঋতবো বৈ প্রযাজা ইতিশ্রুতেঃ। তাভিঃ ধ্রুবৈঃ প্রকৃতৌ বিকৃতৌ চানুষ্ঠেয়তয়া নিশ্চলৈঃ ঋতুভিঃ সহ অগ্নিং আজ্যভাগদেবতাং ঘৃতেন হবিষা কো যজেৎ ন কোপীত্যর্থঃ। 'কস্মৈ' যজমানায় 'হোম' হ্বাতব্যং প্রশস্যং ধনং 'আশু' শীঘ্রং 'দেবাঃ' 'আবহান্' আবহন্তি প্রযচ্ছন্তি ন কস্মাঅপীত্যর্থঃ। ইন্দ্র এব ধনস্য দাতা নান্যে দেবাঃ ইতীন্দ্রঃ স্তূয়তে। 'বীতিহোত্রঃ' প্রাপ্তযজ্ঞঃ 'সুদেবঃ' শোভনদেবতাকঃ 'কঃ' যজমানঃ 'মংসতে' ইন্দ্রং সম্যক্ জানাতি ন কোপীত্যর্থঃ বহুবিধেন স্তোত্রেণ চিরকালোপাসনেন চেন্দ্রঃ প্রত্যক্ষো ভবতি নান্যেন প্রকারেণ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

১৮। কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের নিমিত্ত হবি নির্দেশ করিয়া অগ্নিকে স্তব করিতে পারে? কোন্ ব্যক্তিই বা ইন্দ্র-যাগের নিমিত্ত স্রুক-পাত্র-পূর্ণ হবনীয় ঘৃত দ্বারা নিত্যপূজ্য প্রযাজ দেবতার সহিত অগ্নির যাগ করিতে সমর্থ হয়? ইন্দ্র ব্যতিরেকে কোন্ দেবতা যজমানকে শীঘ্র উৎকৃষ্ট ধন-সম্পত্তি প্রদান করিতে পারেন? কোন্ যজমান অন্য অন্য দেবতার যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়।

৯০৩

বৃহতীচ্ছন্দঃ।

১৯। ত্বমঙ্গ প্র শংসিষো দেবঃ শবিষ্ঠ মর্ত্যং। ন ত্বদন্যো মঘবন্নস্তি মর্ডিতেন্দ্র ব্রবীমি তে বচঃ।

১৯। অত্রেত্যভিমুখীকরণে। 'অঙ্গ 'শবিষ্ঠ' হে বলবত্তম ইন্দ্র 'দেবঃ' দ্যোতমানঃ 'ত্বং' 'মর্ত্যং' মরণধর্ম্মাণং ত্বাং স্তুবন্তঃ পুরুষং 'প্রশংসিষঃ' সম্যগমেন স্তুতমিতি প্রশংস। হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র 'ত্বৎ' 'অন্যঃ' ত্বত্তোহন্যঃ কশ্চিৎ 'মর্ডিতা' সুখয়িতা নাস্তি। অতঃ কারণাৎ 'তে' তুভ্যং ইদং স্তুতিলক্ষণং 'বচঃ' 'ব্রবীমি' উচ্চারয়ামি।

১৯। হে মহাবল ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিশীল। এ ক্ষণে যে তোমার স্তব করিতেছে, সেই ব্যক্তিকে তুমি প্রশংসা কর। হে মঘবন্! তোমা ভিন্ন আর কেহই সুখ-দাতা নাই; এই নিমিত্তই আমি তোমার স্তুতিবাদ করিতেছি।

৯০৪

সতোবৃহতীচ্ছন্দঃ।

২০। মাতে রাধাংসি মাত ঊতয়ো বসোঽস্মান্ কদা চনা দ-

ভন্। বিশ্বা চ ন উপমিমীহি মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য আ। ১। ৬। ৮।

২০। হে 'বসো' নিবাসয়িতঃ ইন্দ্র 'তে' তব সম্বন্ধীনি রাধোভ্যোক্তিরিতি 'রাধাংসি' ভূতানি অস্মান্ 'কদাচন' কদাচিদপি 'মা' 'দভন্' মা বিনাশয়ন্তু। তথা 'উতয়ঃ' গন্তারঃ। যদ্বা 'ধুতয়ঃ' ইত্যত্র বর্ণলোপঃ। ধুতয়ঃ কম্পয়িতারঃ 'তে' ত্বদীয়াঃ মরুতশ্চ মা দভন্। হে 'মানুষ' মনুষ্যহিত ইন্দ্র 'চর্ষণিভ্যঃ' মন্ত্রদ্রষ্টৃভ্যঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'বসূনি' ধনানি চ 'আ' 'উপমিমীহি' সর্ব্বতঃ আহৃত্য অস্মৎসমীপে কুরু। সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং ধনং অস্মভ্যং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। ১। ৬। ৮।

২০। হে বাসপ্রদ ইন্দ্র! তোমার আশ্রিতদিগকে যেন কেহ কদাচ বিনাশ না করে। তোমার এই সঞ্চরণ-শীল সমীরণ হইতে যেন আমরা বিনষ্ট না হই। হে মনুষ্যহিত ইন্দ্র! আমরা মন্ত্রদ্রষ্টা, তুমি আমাদিগকে সমস্ত ধন প্রদান কর। ১। ৬। ৮।

সিন্দূরীয়াপটী ব্রাহ্মসমাজ

তৃতীয় সাম্বৎসরিক বক্তৃতা।

১১ অগ্রহায়ণ ১৭৮৮ শক।

যিনি আমাদিগকে সংসারে আনয়ন করিয়াছেন, অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেছেন, এবং এই ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীরে সংযুক্ত করিয়াও মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তিনিই আমাদের হৃদয়েশ্বর, তিনিই আমাদের গৃহ-দেবতা, তিনিই এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাতা। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী, এবং তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা ও পতিত-পাবন। সমস্ত সংসার তাঁহারই মহিমা গান করিতেছে এবং তাঁহারই যশ ঘোষণা করিতেছে। আমরা তাঁহারই পবিত্র নামে উৎসব করিবার নিমিত্ত বান্ধবগণকে এই তৃতীয় বার আহ্বান করিয়াছি। আজি আমরা কি করিব? সম্বৎসর কাল যাঁহার করুণা অজস্র ভোগ করিয়াছি, আজি হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিব। তিনি আমাদিগকে পিতামাতা অপেক্ষাও অধিক স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছেন, পাপতাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, কত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। কত নিদারুণ শোক হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়াছিল, তিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রেরণ করিয়া কেমন অল্পে অল্পে শান্তি-সলিল দ্বারা তাহাকে শীতল করিয়াছেন। আজি সম্বৎসরের ঘটনা-সকল যতই স্মরণ করিতেছি, ততই তাঁহার প্রেমমুখের উজ্জ্বল জ্যোতি অন্তরে প্রতিভাত হইতেছে। ধন্য জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য, তোমাকে কে বিস্মৃত হইতে পারে।

আজি কি দেখিতেছি? সেই আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের আনন্দ-লীলা এই গৃহে বিলসিত হইতেছে। যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনি এখানেও বিদ্যমান আছেন। আজি হৃদয়ের প্রীতি-পুষ্পে তাঁহার পূজা করিব, মুক্তকণ্ঠে তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব, অসংকোচে তাঁহার প্রেমামৃত পান করিব। আজি ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিব; আজি ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিব। যিনি ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগের উপাস্য দেবতা; তিনি আমাদের হইতে দূরবর্ত্তী নহেন, তিনি প্রচ্ছন্নভাবে সকলের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না; যে ব্যক্তি তাঁহাকে চায়, সে আপনার অন্তরেই তাঁহাকে লাভ করে। ঈশ্বর যাহার অন্তরে নাই, সে ঈশ্বরকে কোন স্থানেই লাভ করিতে পারে না। পবিত্র হৃদয় তাঁহার প্রিয় নিকেতন, যাঁহার হৃদয় যত পবিত্র হয়, তিনি সেই হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়-স্বামী ঈশ্বরকে ততই দেখিতে পান। হৃদয় যদি পাপকলঙ্কে মলিন হয়, তবে ঈশ্বর স্পৃহা পর্য্যন্ত

তাঁহার হৃদয় হইতে পলায়ন করে। পাপ-চিন্তা, পাপালাপ ও পাপানুষ্ঠান এই ত্রিবিধ পাপ দ্বারা হৃদয় দুষিত হয়। সাধু-চিন্তা, সাধু আলাপ ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান হৃদয়কে পবিত্র করে। সেই পবিত্র হৃদয় দ্বারা মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের পূজা করিতে হয়। এই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ। আমরা চিরজীবনের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত অবলম্বন করিয়াছি; কেবল পৃথিবীর জীবনে নয়, অনন্তকাল আমরা এই ব্রত প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যে কএক দিন এই পৃথিবীতে অবস্থান করিব, যেরূপে হউক এই ব্রত রক্ষা করিতেই হইবে। যখন পৃথিবী হইতে অবসৃত হইব, যেখানে যাই এই ব্রতই আমাদের লক্ষ্য থাকিবে। যাঁহারা আমাদের এই ব্রতের প্রতিকূলতা করেন, তাঁহারা আমাদের হৃদয় হইতে শোণিত পান করেন। আমরা আর কিছুই চাহি না, নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত-হৃদয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারিলেই আমরা চরিতার্থ হই। ধন, জন, যশ, মান যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুকূল হইয়া আমাদের নিকট আইসে, আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিব; এই আমাদের সংকল্প। আমরা এরূপ অহঙ্কার করিতে পারি না যে, চির দিন আমরা অটল ভাবে ধর্ম্মপথে দণ্ডায়মান থাকিব; যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পাপ-পঙ্কে পতিত হই, তখন কি করিব? কাঁদিতে কাঁদিতে সেই পতিত-পাবনেরই শরণাপন্ন হইব। তখন তিনি যে দণ্ড দিবেন, মস্তকে করিয়া বহন করিব। এই আমাদের সাহস।

আমরা নিশ্চয় জানিতেছি যে, যে সকল লোকে পরিবেষ্টিত হইয়া আছি, তাঁহারা আমাদের প্রাণগত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কত তিরস্কার করিবেন, কত বিরক্তি প্রকাশ করিবেন, কত পরিহাস করিবেন। তখন আমরা কি করিব? আরও বিনীত হইব, আরও বিনম্র হইব, আরও সহিষ্ণু হইব। কেবল এই প্রতীক্ষা করিব, ঈশ্বর তাঁহাদের পাষাণ-হৃদয়ে কখন প্রেম সঞ্চার করেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আমরা যে রসের আস্বাদন পাইয়া এই পথে পদার্পণ করিয়াছি, ঈশ্বর যদি তাঁহাদের হৃদয়-রসনায় সেই রস এক বিন্দু বর্ষণ করেন, তাঁহাদিগকেও আমাদের ন্যায় ব্যাকুল হইতে হইবে। যিনি আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন, আমরা তাঁহার হিতানুষ্ঠান করিব। ইহাই আমাদের শিক্ষা। এই পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজি তাহার তৃতীয় সাম্বৎসরিক মহোৎসব।

আমাদের উৎসব কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই অলঙ্কৃত নহে, কিন্তু সেই প্রাণ স্বরূপের আবির্ভাব ইহার জীবন্ত ভাব প্রকাশ করিতেছে। অদ্যকার উৎসব সাধুগণের সাধুভাব বর্দ্ধিত করিতেছে, অসাধুদিগকে সাধুভাবে আকর্ষণ করিতেছে; নির্ভয়-চিত্ত উদ্যোগী পুরুষের উৎসাহ দ্বিগুণ করিতেছে, দুর্ব্বল ভীরুগণের হৃদয়ে সাহস দান করিতেছে, ঈশ্বরের পিতৃ-ভাব প্রদর্শন করিতেছে, মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব উজ্জ্বল করিতেছে, ইহ লোকেই সেই স্বর্গধামের আভাস প্রদর্শন করিতেছে। যে ব্রাহ্ম এই উৎসবের অংশভাগী হন, তাঁহার আত্মা সহস্রগুণ বল ধারণ করে। সর্ব্বসন্তাপ-হারী অমৃতময় পুরুষের আলিঙ্গনে আত্মাকে শীতল করা, তাঁহার প্রেমমুখ দর্শন করিয়া আত্মাকে জীবন্ত করা, তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র হওয়া এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, বিপদের সহিত বন্ধুতা করিতে হইবে, শোক দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে

হইবে, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইবে. এই সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইবার জন্য অমৃতময় পিতার নিকট অমৃত পান করা এবং ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মের উৎসাহকর সংসর্গ লাভ করা এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

হে পরমাত্মন্! তোমার চরণের মঙ্গল-চ্ছায়াতে আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসন্ন না হয়; তুমি যেমন অদ্য আমাদিগকে দেখা দিতেছ, এই রূপ চির দিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া সর্ব্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমারদিগকে রক্ষা কর। এ পৃথিবীতে আমারদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই; তুমিই আমারদের পিতা মাতা, তুমিই আমারদের সুহৃৎ। সংসারের অন্ধকার-মধ্যে তুমি আমাদের আলোক; ভয় ও দুর্ব্বলতার মধ্যে তুমি আমারদের বল; অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমিই আমারদের চির সম্পদ্। নাথ! যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া তাবৎ সংসারীরা আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া চির-জীবন-সখা চির-সুহৃদ হইয়া আমারদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ্ আর কোথায় পাইব? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব, হে জীবনের জীবন! আমারদিগকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমারদের সমুদায় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্ত্তিত হউক; সর্ব্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়নাথ! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

থিওডোর পার্কর।

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৬ পৃষ্ঠার পর।

বিশ্ব জগতের উপাসনাই জড়োপাসনার উচ্চ প্রণালী। এই স্থলেই পুরুষোপাসনার বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কোন্ স্থলে জড়োপাসনার পরিসমাপ্তি ও পুরুষোপাসনার প্রারম্ভ হইতেছে, কেহই তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। এই দুই প্রকার উপাসনা-প্রণালী পরস্পর এই রূপ সংশ্লিষ্ট যে, পরস্পরের চিহ্ন পরস্পরেই দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি বহু দেবতার উপাসনা কি জড়োপাসনা এই দুই প্রকার মতের মধ্যেই একটি অসংস্কৃত রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে।

সাধারণের যে একটি কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যেও এই জড়োপাসনার কতকগুলি চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই সম্প্রদায় বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, লোকক্ষয় প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য কখন কখন ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদায় এবং নরাঙ্কিত প্রভৃতি দুর্নিমিত্ত সকল ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বলিয়া স্বীকার করে। ইহারদিগের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর স্থান বিশেষ ও সময় বিশেষে বর্ত্তমান থাকেন। তিনি মনুষ্যের উপবাসানুষ্ঠান কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতসাধন ও উপহার প্রদান প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তুষ্টি লাভ করেন। এই পৃথিবীতে এমন কোন সম্প্রদায়ই নাই, যাহা এই জড়োপাসনা মতের কোন না কোন চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত হয় নাই। বর্ত্তমান খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

এই উপাসনার মত হইতে উপাসকদিগের আত্মার উন্নতি সম্পাদন, হিতকরী নীতির ও কোন রূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় নাই। এই ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কার্য্য সকল অনিয়ন্তৃত-ইচ্ছা-সম্ভূত অসঙ্গত ও অপ্রা-

কৃতিক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পিশাচ-সিদ্ধ ও মায়াজীবিদিগের পৌরোহিত্যের প্রাদুর্ভাব হয়। ইহারা যে পরিমাণে ধর্ম্মের অধিকার বৃদ্ধি করে, সেই পরিমাণে সমাজ-মধ্যে অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। বৈরাগ্যে উৎসাহ প্রদান, উপাসকদিগের উপর দুর্ব্বহ কার্য্য-ভার নিক্ষেপ করাই ইহাদিগের ব্যবসায়। ঘৃণাকর ত্বক্‌ছেদ, ভয়ঙ্কর ত্যাগ-স্বীকারই ইহাদিগের ব্যবস্থা। ইহারা দেবতার নামে নরবলি প্রদান করিয়া থাকে। এই সমস্ত নরাধম পামর আপনাদিগের কপটাচারে সাংসারিক চক্ষু নিক্ষেপ এবং জ্ঞান ও বিশ্বাস এই দুইটির বিরোধ আলোচনায় প্রতিষেধ করিয়া ধর্ম্মকে শৈশবাবস্থায় ব্যবস্থাপিত করে। তথাচ এই সম্প্রদায় চিন্তা ও অনুশীলনে তৎপর হইয়া বিজ্ঞান ও শিল্পের সামান্য রূপ উন্নতি সাধন এবং যে সমস্ত কার্য্য এই ধর্ম্মের অনুমোদিত পরম্পরায় তাহারও অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়াছে।

এই উপাসনার নীচ প্রণালী অনুসারে প্রাকৃতিক নিয়মকে পদতলে নিক্ষিপ্ত ও দলিত করা হইতেছে। উপাসকদিগের মত এই যে, প্রত্যেক বস্তুর জীবন আছে। সমুদায় দৃশ্য পদার্থেরই ক্ষয়, বৃদ্ধি ও পুনরুৎপত্তি আছে। বৎসরের ঋতু, আকাশের নানা প্রকার পরিবর্ত্ত ও এই রূপ প্রাকৃতিক ঘটনা সকল দেবগণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মায়াজীবি পুরোহিতগণ স্বেচ্ছাক্রমে নভোমণ্ডল ঘন ঘটার আচ্ছন্ন ও মুষলধারে বারি ধারা নিপাতিত করিতে পারেন। মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি অভিচারক্রিয়া-পারদর্শী বৃদ্ধারা চন্দ্র-মণ্ডল খণ্ড খণ্ড করিতে সমর্থ হয়। মায়া-জীবিরা দুশ্চিকিৎস পীড়ার আক্রমণ অনায়াসেই নিবারণ করিতে পারে। এই অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম অলৌকিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। যাহারা ইতর সাধারণ অপেক্ষা প্রাকৃতিক নিয়ম বিলক্ষণ অবগত আছে, সেই সমস্ত ধূর্ত্তেরাই ঐন্দ্রজালিক, অলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠায়ী, পুরোহিত, জ্যোতিষিক, ভবিষ্যদ্বক্তা, চিকিৎসক এবং দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

যখন মনুষ্যেরা হর্ষ বিষাদ ও সুখ দুঃখের ভাব সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইতে লাগিল, তখন বিবেচনা করিল এই সমস্ত বিষয় কদাচই এক দেবতার কার্য্য হইতে পারে না। তখন তাহারা শুভ ও অশুভের স্রষ্টা দেবতাদিগের একটি বিভাগ কল্পনা করিল। এই বিভাগ নির্দ্দেশ প্রায় সকল ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ কর, তাহাতেও শুভাশুভের দেবতা স্বতন্ত্র দেখিতে পাইবে। উপাসকেরা এই দুই প্রকার দেবতারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এক দেবতার ক্রোধ শান্তি ও আর একটি দেবতার প্রসন্নতার নিমিত্ত প্রচুর উপহার প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সমস্ত উপহার দেবতাদিগের চরিত্র এবং জাতিগত ও ব্যক্তিগত চরিত্রের অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই সময়ে মনুষ্য-সমাজের আর এক প্রকার ভাব উপস্থিত। যখন প্রত্যেকেরই দেবতা স্বতন্ত্র এবং ঐ সমস্ত দেবতার মধ্যে প্রত্যেকেরই ভাব স্বতন্ত্র হইল, তখন মনুষ্যের মধ্যে যে একটি প্রীতি-সূত্র ছিল, তাহা উচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মনুষ্যেরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে লাগিল। দেবগণের মধ্যে বিরোধ-ভাবই মনুষ্য-সমাজের বিরোধ-ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিল। এই রূপে একটি পরিবার আর একটি পরিবারের প্রতি, একটি বংশ আর একটি বংশের প্রতি এবং একটি জাতি আর

একটি জাতির প্রতি ঘোরতর বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইত। যে জাতি অতিশয় নিষ্ঠুর তাহার দেবতাও যার পর নাই নিষ্ঠুর হন এবং বিপক্ষের শোণিতই তাঁহার প্রীতিকর উপহার হইয়া থাকে। যে সমস্ত বিদেশী দৈবাৎ উপস্থিত হইত,এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকে দেবগণের পূজোপহার বলিয়া বিবেচনা করিত। ঐ সকল ভণ্ড তপস্বীরাই স্বহস্তে আগন্তুক ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিয়া আপনার ইষ্ট দেবতার তৃপ্তি সাধন করিত। এই অবস্থায় যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায়ই উপস্থিত হইত এবং উহা একটি স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া সমাজ-মধ্যে গণনা করিত। সংগ্রাম-কালে যাহারা বন্দীরূপে আনীত হইত,এই সম্প্রদায় তাহাদিগকে দেবতার সন্নিধানে বলি প্রদান করিত। ইহাদের সমুদায় চেষ্টা সৃষ্টি-রক্ষার্থ বিনিযোজিত না হইয়া সৃষ্টি-সংহারেই ব্যয়িত হইত। এই অবস্থায় যুদ্ধই পুরুষের কার্য্য ও ভূমি কর্ষণাদি স্ত্রী জাতির কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেবতারা স্বয়ং রণস্থলে আধিপত্য এবং বীরগণের শত্রু-শোণিত-সিক্ত হস্তকে পুরস্কার প্রদান করিতেন। ইঁহারাই যুদ্ধের দেবতা, ইঁহাদের হইতেই মনুষ্যের যুদ্ধ শিক্ষা ও যুদ্ধে উৎসাহ প্রদত্ত হইত।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এই মতের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহুদীরা প্রথমে জড়োপাসক ছিল। পরে এই মত পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোপাসনা তৎপরে একেশ্বরোপাসনা অবলম্বন করে। এই জাতির সহিত নিরপরাধ শান্তস্বভাব কানানাইট জাতির ঘোরতর বৈরভাব জন্মে। এই দুইজাতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসক ছিল। ইহুদিরা যে দেবতার উপাসনা করিত, সেই দেবতা কানানাইট দিগের উপাস্য ছিলেন না; এই নিমিত্ত তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহাদের বিনাশ কামনা করেন। দেবতার আদেশানুসারে স্ত্রী, পুরুষ ও বালকেরা পর্য্যন্ত শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিত না। পূর্ব্বকালে মেক্‌সিকো প্রভৃতি স্থানে এই রূপ প্রণালী অনুসৃত হইত। এক্ষণেও দক্ষিণ মহাসাগরের দ্বীপ-শ্রেণীতে এই ভীষণ কার্য্যের কএকটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

এই রূপ যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা লোকের বুদ্ধিবৃত্তির চালনা হওয়াতে জাতি-সাধারণ্যে একটি উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত এবং ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব অবগত হইবার অবসর উপস্থিত হইল। যুদ্ধ যে এমন নিষ্ঠুর, সেও মনুষ্য-হৃদয়ে বিজ্ঞানের আলোক প্রবেশিত করিয়া দিল। তখন মনুষ্য-সমাজে অপেক্ষাকৃত সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে মনুষ্যত্ব মস্তক উন্নত করিবার প্রকৃত সময় প্রাপ্ত হইল। ধর্ম্মের সহিত নীতির সংযোগ হওয়াতে পৃথিবী মঙ্গল ও শান্তির আয়তন হইতে লাগিল। ফলত তৎকালে মনুষ্যের মনে এই রূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, যদি পরাজিত ব্যক্তিরা জেতৃবর্গের দেবতার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর বধ-দণ্ড প্রদান করা হইবে না। সমাজ-মধ্যে এই রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইলে শতশত ব্যক্তি প্রিয়তর প্রাণ রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল; কিন্তু যদিও তাহারা অগত্যা জেতৃজাতিদিগের দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিত, তথাচ আপনাদের অভীষ্ট দেবতার উপাসনায় ক্ষান্ত হয় নাই। এই অবস্থায় কেবল বিজিত উপাসকদিগকে নয়,উপাস্যদিগকেও নিয়মে বদ্ধ হইতে হইয়াছিল। বিজিত জাতির দেবতাকে জেতৃজাতীয় দেবতার নিকট সম্পূর্ণ অধীনত্ব স্বীকার করিতে হইত। দেবতারা বিজিতদিগের দৈহিক রক্তের পরিবর্ত্তে দৈহিক পরিশ্রম আপনাদিগের তৃপ্তি

সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচনা করিতেন। কিন্তু পুরোহিতেরা এই রূপ পরিবর্ত্তের মুখে ব্যাঘাত প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই পরিবর্ত্তকে দেবগণের অনুমোদিত নহে বলিয়া যাহারা শত্রু-হস্ত হইতে মুক্ত হইত, তাহাদিগকে যথোচিত ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেন। কিন্তু পুরোহিতদিগের আদেশ ও উপদেশ তখন আর সম্যক্ প্রতিপালিত হইত না। যখন প্রকৃত সত্যের আলোক লাভ করিয়া মনুষ্য অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়,তখন কোন বিঘ্নই তাহাদের গতি রোধ করিতে পারে না।

পুরুষোপাসনা ধর্ম্মোন্নতির দ্বিতীয় সোপান। এস্থলে ইন্দ্রিয়-বোধের উপর চিন্তা-শক্তি আধিপত্য করে। এস্থলে প্রকৃতির নিয়ম ও পশুপক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুগণের অভ্যাস মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। প্রকৃতি ও পশুপক্ষী উপাস্য পদার্থ বলিয়া আর বিবেচিত হয় না। জড়োপাসনার পর এই পুরুষোপাসনা জনসমাজ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল। এই উপাসনাও আবার দুই প্রকার। একটি অন্ধ-শক্তির উপাসনা, আর একটি জ্ঞান-শক্তির উপাসনা। গ্রিশ দেশে এই পুরুষোপাসনার মত প্রচলিত হইবার প্রথমাবস্থায় অন্ধ-শক্তি উপাসনারই সম্যক্ প্রাদুর্ভাব ছিল। গ্রিশ দেশীয় দেবতারা পৃথিবী, আকাশ ও সমুদ্রের পুত্ররূপে কল্পিত হইয়া ছিল এবং আকাশ সমুদ্র প্রভৃতি পদার্থ সকল অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইত। এই দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,ঐ দেশে এমন কতকগুলি প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন যে, তাঁহারা প্রাকৃতিক শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। কিন্তু তৎপরে যে সমস্ত পুরাবৃত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তন্মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি পূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তিকে দেবত্ব প্রদান করা হইয়াছে। সেই দেবতা ওলিম্পস্ পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে এই পৃথিবীকে শাসন করিতেন। তৎকালে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমুদায়কে দেবত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহারা ঐ দেবতার অধীন ছিল। এই জ্ঞান-শক্তির দেবত্ব-কালে আর অন্ধ-শক্তির উপাসনা হইত না। এই অবস্থায় কেবল মনুষ্যকে দেবত্ব প্রদত্ত এবং সে উপাসিত হইত। এস্থলে উপাস্য ও উপাসকের প্রভেদ এই যে, উপাস্যেরা উপাসক দিগের ন্যায় মনুষ্য-গর্ভে সঞ্জাত ও প্রতিপালিত হইতেন বটে; কিন্তু তাঁহারা উপাসকদিগের ন্যায় মৃত্যুর বশম্বদ ছিলেন না। তাঁহারা চিরকালই নবযৌবন-সম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকিতেন। তাঁহারা বিবাহাদি করিয়া বংশ বিস্তার করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ প্রকৃতির উপর কেহ বা শিল্পের উপর আধিপত্য করিতেন। প্লুটো মৃত ব্যক্তিদিগের নিকেতন, নেপচুন সমুদ্র এবং ভূলোক ও দ্যুলোক শাসন করিতেন। কতগুলি দেবতাকে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। এক দেবতা সুবর্ণ চক্র-চিহ্নিত রথে আরোহণ করিয়া দিবসের উপর, আর এক দেবী রজনীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। উৎকৃষ্ট প্রস্রবণ, সুন্দর বৃক্ষ, রমণীয় পর্ব্বত ইহাঁদের বাসস্থান ছিল। এমন কি, মনুষ্যের সুদৃশ্য আকারও দেবতার পবিত্র মন্দির বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। ফিবস আপোলো, থর, মার্স্ প্রভৃতি কতকগুলি দেবতা শিল্পের উপর আধিপত্য করিতেন। যাহাই হউক অনন্ত জ্ঞান অনন্ত শক্তি ও অনন্ত প্রীতি এই সমস্ত দেবতার মধ্যে কাহারই ছিল না। মনুষ্যের ন্যায় ইহাঁদের প্রত্যেকেরই সঙ্কীর্ণ ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং মনুষ্যের যেমন নানা প্রকার চরিত্র-দোষ উপ-

স্থিত হয়, এই সমস্ত দেবতাদিগের তাহাও দৃষ্ট হইত। মনুষ্যেরা যেমন লুব্ধ-স্বভাব, ইহাঁদের মধ্যেও অনেকে সেই রূপ আছেন। রোমিয়েরা শত্রুদিগের দেবগণকে শত্রু-নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদিগের দল-মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইত। এই সমস্ত দেবতার মধ্যে সকলের শক্তি সমান রূপ ছিল না, এক জন দেবদলের অধিপতি হইতেন, তাঁহাকে দেবরাজ বলিয়া সকলে আহ্বান করিত, তিনি অন্যান্য দেবগণকে স্বেচ্ছানুসারে শাসন করিতেন।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৫ পৃষ্ঠার পর।

বৈদিক গ্রন্থ সমুদায় অতি পবিত্র বলিয়া চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে, এই নিমিত্ত পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা উহার কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে সাহসী হন নাই। গ্রন্থকর্ত্তারা স্ব স্ব গ্রন্থে যে সমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় এক্ষণে অবিকৃতই দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের স্থান-সন্নিবেশ ও প্রাকৃতিক গুণ যে রূপ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিগোচর হয়, সামাজিক ব্যবহারও সেই রূপ। যে দেশের আয়তন অল্প তথাকার পূর্ব্বতন সামাজিক আচার ও ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকার হইলেও তাহা সম্যক্ নির্ণয় করা যাইতে পারে, কিন্তু যে দেশ অতিশয় প্রশস্ত,তাহার বিষয় সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া সহজ নহে। এই ভারতবর্ষের বিষয়ও সেই রূপ। কিন্তু যদিও এই ভারতবর্ষে দেশ-ভেদে আচার বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়, এবং এক্ষণে তাহার ইয়ত্তা করাও সুকঠিন, তথাচ ঐ সমস্ত আচার ব্যবহারের মধ্যে জনশ্রুতি যত গুলিকে বহন করিয়া আসিতেছিল, পৌরাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের অত্যুক্তি-দোষে তৎসমুদায় এক প্রকার অবিশ্বাস্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বৈদিক গ্রন্থে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন আচার নিরূপণ করিতে হইলে বৈদিক গ্রন্থই অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হইবে।

বৈদিক গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার যে বিভিন্ন প্রকার ছিল, গ্রন্থকর্ত্তারাও তাহা সুস্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদিচ সমুদায় ভারতবর্ষকে এক রূপ আচার-সূত্রে বদ্ধ করা ব্রাহ্মণদিগের অভিপ্রেত ছিল কিন্তু তৎকালে তাঁহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শ্রৌতসূত্র এক খানি ব্যবহার-পদ্ধতি-নিরূপক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতবর্ষীয়েরা সকলেই যে এক রূপ আচার-নিষ্ঠ হইয়া ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় পবিত্র-স্বভাব হইবে, গ্রন্থকর্ত্তা তাহার আভাস দিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের এই রূপ উদ্দেশ্য থাকিলেও তাহা ফলে পরিণত হয় নাই। ব্যবহার-কালে সকলেই আপন আপন বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত আচারই শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিত। কিন্তু গৃহ্য-সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে সূত্রকার বংশ-পরম্পরাগত আচারের অনুমোদন করিয়াছেন। উহার এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে এই রূপ লিখিত হইয়াছে যে দেশাচার ও কুলাচার যদি ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম-বুদ্ধির নিতান্ত পরিপন্থী না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিবে*।

---

* পারস্কর গৃহ্য সূত্রের টীকায় এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে আপনার বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত আচার পরিত্যাগ করিয়া অন্যের আচার অবলম্বন করা নিতান্ত অন্যায়।

শাখান্তরীয় কর্ম্মণে দোষমাহ বসিষ্ঠঃ। নজাতু পরশাখোক্তং বুধঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ। আচরণ্ পরশাখোক্তং

ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা যদিও এই সমস্ত গৃহ্য কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে কিন্তু তৎ সমুদায় শ্রুতিমূলক নহে, স্মৃতিই এই সকলকে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। দেশ বিশেষ ও গ্রাম বিশেষের আচার ব্যবহার-সকল কতকগুলি যে শাস্ত্র-মূলক ও কতক গুলি যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাহার উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন যে, যে সকল আচার কুলক্রমাগত তাহার পরিপন্থী হওয়া অনুচিত। আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে এই রূপ লিখিত আছে যে জনপদ-ধর্ম্ম ও গ্রাম-ধর্ম্ম নানা প্রকার। বিবাহ কালে এই সকল অনুসরণ করিবে কিন্তু যাহা সাধারণ-ধর্ম্ম আমরা তাহা নির্দ্দেশ করিব *। এই স্থলে টীকাকার লিখিয়াছেন যে জনপদাদি ধর্ম্মের সহিত যদি বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ ধর্ম্মই প্রতিপালন করিবে। আমরা যাহা বলিব, তাহাই সাধারণ-ধর্ম্ম। যদি বিদেহ রাজ্যে উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দৃষ্ট হয়, আর গৃহ্য-সূত্রে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানের বিধি থাকে, সে স্থলে গৃহ্য-সূত্রোক্ত ধর্ম্মই প্রতিপালন করিবে, দেশ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা নিষিদ্ধ †। গৌতম-সূত্রেও এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, দেশাচার ও কুলাচারের বিষয় যদি বেদের মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে মাতুল-কন্যার পাণি-গ্রহণের ন্যায় যদি বেদ-ব্যবস্থার নিতান্ত বিরুদ্ধ না হয়, তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ‡।

গোভিল-তনয়-প্রণীত গৃহ্য-সংগ্রহ-পরিশিষ্টে আছে যে বসিষ্ঠ বংশীয়েরা মস্তকের দক্ষিণে চূড়া ধারণ করিতেন। অত্রি বংশীয়দিগের তিন চূড়া ও আঙ্গিরসদিগের

শাখারণ্ডঃ স উচ্যতে। যঃ স্বশাখোক্ত মুৎসৃজ্য পরশাখোক্ত মাচরেৎ। অপ্রমাণমৃষিং কৃত্বা সোহন্ধে তমসি মজ্জতে। স্মৃত্যন্তরেঽপি। স্বকর্ম্ম পর্য্যুৎসৃজ্য তু যদন্যৎ কুরুতে নর। অজ্ঞানাদথবা লোভাৎ স হতঃ পতিতো ভবেৎ। ছন্দোগ-পরিশিষ্টেঽপি। স্বশাখাশ্রয় মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ং তু যঃ। কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্ম্মেধা মোঘং তস্য চ যৎকৃতং॥

মহর্ষি বসিষ্ঠ অন্য শাখার নিয়ম অবলম্বন করিবার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি কহেন বিবেচক মনুষ্য অন্য শাখোক্ত কার্য্য কদাচই অনুষ্ঠান করিবেন না। যিনি অন্য শাখোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে শাখারণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি ঋষি-বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বশাখোক্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর-শাখোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হন। অন্য স্মৃতিতেও এই রূপ লিখিত হইয়াছে। যিনি আপনার শাখোক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞানতা ও লোভ বশত অন্যের শাখোক্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তিনি পতিত ও বিনষ্ট হন। ছন্দোগ পরিশিষ্টেও এই রূপ লিখিত আছে। যে মন্দ বুদ্ধি আপনার শাখাশ্রিত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরশাখোক্ত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহার কার্য্য নিষ্ফল হয়।

যদি কোন বংশে কোন কার্য্যের বিশেষ নিয়ম না থাকে, তাহা হইলে পর শাখোক্ত নিয়ম গ্রহণ করা অনুচিত নহে।

স্বশাখানুক্তমপি পরশাখোক্তং গ্রাহ্যং। তথাচ কাত্যায়নঃ যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পরোক্ত মবিরোধিচ। বিদ্বদ্ভিস্ত-দনুষ্ঠেয় মগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবৎ। সূত্রান্তরানুক্তমপি স্মৃত্যুক্তং গ্রাহ্যং।

স্ব শাখায় যাহা উক্ত হয় নাই, তাহা যদি পর শাখায় উক্ত ও অবিরুদ্ধ হয়, তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কাত্যায়ন কহিয়াছেন যে স্বশাখায় যে নিয়মের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, পর শাখায় যদি তাহার উল্লেখ থাকে এবং তাহা যদি বিরোধী না হয়, বিদ্বান ব্যক্তিরা অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের ন্যায় তাহার অনুষ্ঠান করিবে। যে নিয়ম সূত্রান্তরে নাই তাহ যদি স্মৃতিতে থাকে, গ্রহণ করিবে।

* অথ খলূচ্চাবচা জনপদধর্ম্মা গ্রামধর্ম্মাশ্চ তান্ বিবাহে প্রতীয়াৎ যত্তু সমানং তদ্বক্ষ্যামঃ। আশ্বলায়ন সূত্র।

† জনপদাদিধর্ম্মাণাং বক্ষ্যমাণানাং ধর্ম্মাণাঞ্চ বিরোধে সতি বক্ষ্যমাণং ধর্ম্মমেব কুর্য্যাৎ ন জন পদাদিধর্ম্ম মিতি। যৎ বক্ষ্যাম স্তৎ সর্ব্বত্র সমান মিত্যেবার্থঃ। বৈদেহেষু সদ্যএব ব্যবায়ো দৃষ্টঃ। গৃহ্যেষু ব্রহ্মচর্য্যং বিহিতং। তত্র গৃহ্যোক্ত মেব কুর্য্যাৎ ন দেশধর্ম্ম মিতি সিদ্ধং।

‡ টীকাকার হরদত্ত কহিয়াছেন যে, কোন কোন দেশে বেদের বিরুদ্ধ কতকগুলি আচার প্রচলিত আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, যখন সূর্য্য মেষ রাশিতে অবস্থিতি করিবেন, সেই সময় বালিকারা ভূতলে গৈরিকাদি চূর্ণ দ্বারা অশ্ব রথাদির সহিত তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে পূজা করিবে। মার্গশীর্ষ মাসে ঐ সকল বালিকারা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধাণ পূর্ব্বক প্রতি পল্লীতে পর্য্যটন করিয়া যাহা কিছু উপহার প্রাপ্ত হইবে, তাহা দেবতাকে দিবে। যখন পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে সূর্য্যের সঞ্চার হয়, তখন ঐ সকল বালিকা উমা দেবীর পূজা করিয়া মাস ও লবণ প্রদান করিবে। যখন সূর্য্য উত্তর ফল্গুনীতে গমন করে, তখন উহারা শ্রী দেবীর পূজা করিবে।

পঞ্চ চূড়া ধারণ করিবার প্রথা ছিল। ভৃগু বংশীয়েরা মস্তকের সকল মুণ্ডন ও অন্যে একটি শিখা ধারণ করিতেন *।

কর্ম্ম-প্রদীপে লিখিত আছে যে বসিষ্ঠোক্ত সমুদায় যজ্ঞ আমিষশূন্য করিয়া অনুষ্ঠান করিবে †।

আধুনিক ব্যবস্থা-সংগ্রহকার রঘুনন্দন এক স্থলে হরিবংশ হইতে এই রূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, শক ‡ জাতীয়েরা মস্তকের অর্দ্ধ মুণ্ডন এবং যবন ¶ ও কাম্বোজেরা সর্ব্বমুণ্ডন করিত। পারদ জাতীয়েরা § কেশ উন্মুক্ত করিয়া রাখিত এবং পহ্নবেরা * শ্মশ্রু ধারণ করিত†।

এক্ষণে ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছে যে যখন এইরূপ এক একটি ব্যবহারের এই প্রকার এক একটি প্রবাদ আছে, ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন বংশের এক এক জন আচার-প্রবর্ত্তক ছিলেন। বোধ হয় পরিশেষে তাঁহারাই এক এক বংশের দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকিবেন‡। দেখ, বেদের যে যে অংশ কোন কোন বিখ্যাত ভদ্র বংশের অধিকৃত বলিয়া প্রথিত আছে, সেই সেই অংশে পুরুরবা কুৎস প্রভৃতি কত গুলি দেবতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে এই সমস্ত দেবতাকে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারাই বোধ হয় যে, ইহাঁরা আপনার বংশে যে আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, তাহা অন্য বংশীয়দিগের অপ্রীতিকর হইয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত দেবতারা সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারেন নাই।

ঋগ্বেদের সূক্ত-মধ্যে যে কতকগুলি উপাখ্যান আছে, সেই সকল অ.ধ.র ব্রাহ্মণ-ভাগে পরিগৃহীত ও সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। সেই উপাখ্যান গুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে, এক্ষণে যাহা বেদ-মূলক বলিয়া সাধারণের সেব্য হইয়াছে, সেই নিয়মই

---

* দক্ষিণকপর্দ্দা বাসিষ্ঠা আত্রেয়া স্ত্রিকপর্দ্দিনঃ।
আঙ্গিরসঃ পঞ্চ চূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে।

† বসিষ্ঠোক্তো বিধিঃ কৃৎস্নো দ্রষ্টব্যোঽত্র নিরামিষঃ। কর্ম্ম প্রদীপ।

‡ সিদিয়ান।

¶ গ্রিক।

§ পারদেসি দেশের অধিবাসী।

* কেহ কেহ পারসীকদিগকে পহ্নব নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

† অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্নবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায় বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥

‡ বৈদিক সময়ের পরে যখন বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চতুর্ব্বেদীচ যো বিপ্রো বাসুদেবং ন বিন্দতি।
বেদভারভয়াক্রান্তঃ স বৈ ব্রাহ্মণগর্দ্দভঃ॥
তস্মাদবৈষ্ণবত্বেন ব্রাহ্মণ্যাদি বিহীয়তে।
বৈষ্ণবত্বেন সংসিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
নারায়ণং পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং হি দৈবতং।
সোম সূর্য্যাদয়ো দেবাঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিশামপি॥
শূদ্রাদীনাস্তু রুদ্রাদ্যা অর্চ্চনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।
যত্র রুদ্রার্চ্চনং প্রোক্তং পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি॥
তদব্রহ্মণ্যবিষয় মেবমাহ প্রজাপতিঃ।
রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ পুরাণেষু চ গীয়তে॥
ক্ষত্রবিট্ শূদ্র জাতীনাং নেতরেষাং তদুচ্যতে।
তস্মাৎ ত্রিপুণ্ড্রং বিপ্রাণাং ন ধার্য্যং মুনিসত্তমাঃ॥

বশিষ্ঠ স্মৃতি প্রথম অধ্যায়।

যে ব্রাহ্মণ চারি বেদ সম্যক্ অধ্যয়ন করিয়া বাসুদেবকে না লাভ করিতে পারেন, তিনি বেদভার ভয়ে আক্রান্ত ও ব্রাহ্মণের মধ্যে গর্দ্দভ বলিয়া পরিগণিত হন। অতএব বৈষ্ণব না হইলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অপগত হয়। কিন্তু বৈষ্ণব হইলে ব্রাহ্মণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন সন্দেহ নাই। নারায়ণ বিষ্ণুই পর ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণের দেবতা। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি কএকটি কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দেবতা। কিন্তু শূদ্রাদি জাতি যত্ন সহকারে রুদ্রাদি দেবতারই অর্চ্চনা করিবে। প্রজাপতি কহিয়াছেন যে পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে যে স্থলে রুদ্রের উপাসনার বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে। পুরাণে রুদ্রের আরাধনা ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ কীর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পক্ষেই তাহা বিহিত হয়; অন্য জাতির পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ। অতএব হে মহর্ষিগণ। ত্রিপুণ্ড্র ধারণ ব্রাহ্মণের কদাচই কর্ত্তব্য নয়।

উহাতে প্রতিপালিত হয় নাই। ব্যবস্থা-শাস্ত্র প্রণেতা দিগের অভিপ্রায় এই যে কেবল ব্রাহ্মণই বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ সাধন ও যজ্ঞীয় দক্ষিণা গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্য জাতির ইহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। মহর্ষি কাক্ষীবান এক জন প্রসিদ্ধ-বেদ প্রণেতা ছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথম ও নবম মণ্ডলের সূক্ত-সকল তাঁহারই রচনা। লোকে বিশেষ কারণে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। এক স্থলে এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ মহর্ষি রাজা স্বায়ন হইতে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি মনু কহিয়াছেন যে, ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিতান্ত নিষিদ্ধ, উহা ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম*। সুতরাং কাক্ষীবান ক্ষত্রিয় হইয়া রাজার নিকট যে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা মনু-বিরুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্মার্ত্ত-কালের গ্রন্থকর্ত্তারা কৌশলে এই দোষ পরিহার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে, কাক্ষীবান যদিও রাজা কলিঙ্গের পুত্র কিন্তু যাঁহার সূক্ত-সকল ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে দৃষ্ট হয়, সেই প্রাচীন ঋষি দীর্ঘতমা তাঁহার প্রকৃত পিতা। এই ভারতবর্ষের অতি প্রচীন কালে ক্ষেত্রজ-সন্তানোৎপাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রন্থকর্ত্তারা এই সম্ভাবনা করিয়া কাক্ষীবানকে কলিঙ্গের ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যদি স্থির চিত্তে বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষত্রিয়ের প্রতিগ্রহ নিতান্ত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণেরা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া পরম্পরাগত উপাখ্যানটি রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। ঋগ্বেদের সূক্ত-প্রণেতা ঋষিগণ যে, ব্যবস্থা শাস্ত্রের অনুমোদিত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, ইহা যার পর নাই অসম্ভব। বৈদিক কাল স্মার্ত্তকালের পূর্ব্ববর্ত্তী। যখন ঐ সমস্ত মহর্ষি জীবিত থাকিয়া সূক্ত রচনা করেন, তখন ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণীত হয় নাই। যাহাই হউক, কাক্ষীবান রাজা কলিঙ্গের ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন; কিন্তু ইহা সাহসের সহিত বলিতে পারা যায়, যখন কাক্ষীবান জীবিত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি আবশ্যক হইলে কখন ধর্ম্ম যাজকের কার্য্য ও কখন বা রণস্থলে বীরের কার্য্য করিতেন। তাঁহার সময়ে জাতি বিশেষে কার্য্য বিভাগ কিছু মাত্র ছিল না। এই বিষয়ে অধ্যাপক লাসেন যে রূপ কহিয়াছেন, তাহা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি কহেন, কাক্ষীবানের পিতা মহর্ষি দীর্ঘতমা বঙ্গ দেশের দক্ষিণ বিভাগে অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের এক জন প্রাচীন ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। ঐ সময় অন্যান্য মহর্ষিগণও ভারত বর্ষের বিভিন্ন অংশে আপনাদিগের আধিপত্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হন। ইহা দ্বারা এই রূপ সম্ভাবনা করা যাইতে পারে যে ঐ সময়ের পরে জাতি-বিভাগ, প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন কার্য্য ও অধিকার যে রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তখনও সে রূপ হয় নাই। ঐ সময়ের পরে এই রূপ এক নিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল যে, শূদ্রের সমক্ষে ঋগ্বেদ উচ্চারণ করিলে পাপ স্পর্শে। কিন্তু আমরা ঋগ্বেদ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে উহার কতকগুলি সূক্ত শূদ্র কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। মহর্ষি কবষ ঐলূষ এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঋগ্বেদের দশম অনুবাকের কতকগুলি সূক্ত প্রণয়ন করেন। ঐ মহর্ষি এক সময়ে দাসী-পুত্র বলিয়া যজ্ঞস্থল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তৎপরে দেবগণের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে যজ্ঞীয়

* ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ম্প্রতি। অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ পরিগ্রহঃ। মনু-১০ অ, ৭৭ শ্লো।

কার্য্যে ব্রতী করা হয়*। তিনি যে দাসী-পুত্র ছিলেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ কৌশীতকী ব্রাহ্মণ এবং মহাভারতও ইহা সপ্রমাণ করিতেছে। এই সমস্ত নিদর্শন দ্বারা ইহাই বোধ হয় যে, জাতি বিচার স্বার্থপর স্মৃতি-শাস্ত্রকারদিগের দ্বারাই ভারত বর্ষে আনীত হয়। স্মৃতিকারদিগের পূর্ব্বে এক্ষণকার ন্যায় জাতিগত কার্য্যের বিধি কিছু মাত্র দৃষ্ট হয় না।

ন চক্ষুষা ন মনসা ন বাচা দূষয়েদপি।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা দূষণং ব্যাহরেৎ ক্কচিৎ ॥
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জীবিত মাসাদ্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥

---

* ঋষয়োবৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। তে কবষং ঐলূষং সোমাদনয়ন্ দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবোঽব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি। তং বহির্ধন্বোদবহন্নত্রৈনং পিপাসা হন্তু সরস্বত্যাউদকং মা পাদিতি। স বহির্ধন্বোদূল্হঃ পিপাসয়া বৃত্তএতদপোনপ্ত্রীয়মপশ্যৎ প্রদেবত্রা ব্রহ্মণে গাতু-রেত্বিতি। তেনাপাং প্রিয়ং ধামোপাগচ্ছৎ। তমাপোঽনুদায়ংস্তং সরস্বতী সমন্তং পর্য্যধাবৎ। তস্মাদ্ধাপ্যেতর্হি পরিসারমিত্যাচক্ষতে। যদেনং সরস্বতী সমন্তং পরিসসার তে বাঋষয়োঽব্রুবন্ বিদুর্ব্বা ইমং দেবা উপেমং হ্বয়ামহা ইতি তথেতি তমুপাহ্বয়ন্ত। তমুপহুয়ৈতদপোনপ্ত্রীয়মকুর্বত প্রদেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেত্বিতি।

একদা ঋষিগণ সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ আরম্ভ করেন, এবং দাসীপুত্র কিতব অব্রাহ্মণ কি রূপে আমারদিগের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে বলিয়া কবষ ঐলূষকে যজ্ঞীয় সোম হইতে নিরাকরণ পূর্ব্বক পিপাসায় ইহার প্রাণ নষ্ট হউক এই অভিসন্ধিতে যাহাতে সে সরস্বতীর জল পান করিতে না পায় এই জন্য তাঁহারা যজ্ঞ স্থানের বহিঃ প্রান্তরে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যান। পরে কবষ ঐলূষ সেই প্রান্তরে পতিত পিপাসায় কাতর হইয়া জলদাতা বরুণের উদ্দেশে ব্রহ্ম গান করেন, তাহাতেই তিনি বরুণ দেবের প্রিয় ধাম প্রাপ্ত হয়েন। তখন জল তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ও সরস্বতী নদীও আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল, এই নিমিত্তই জলের নাম পরিসার হইয়াছে। যে হেতু সরস্বতী নদী আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল, সেই জন্য ঋষিরা কহিলেন, আমরা জানিলাম দেবতারা ইঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন, অতএব আমরাও ইঁহাকে আহ্বান করি। পরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, ইনি ব্রহ্ম গান করুন ইনি সোমের অধিকারী হউন বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন।

বিজ্ঞান

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৭১ পৃষ্ঠার পর।

২চিত্র
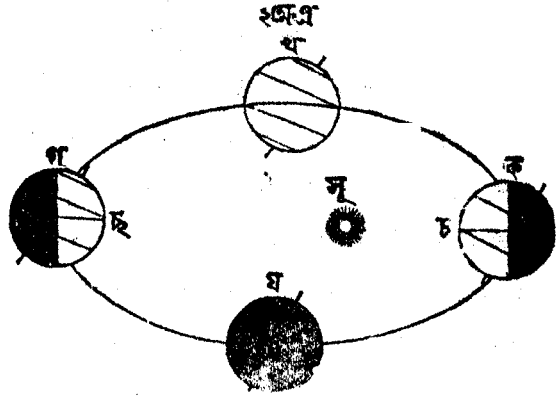
পৃথিবীস্থ জীব মাত্রেরই দুই প্রকার অবস্থা আছে। একটি জাগ্রদবস্থা আর একটি সুপ্তাবস্থা। যে সময় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সমুদায় তেজস্বী থাকিয়া উহারা পরিশ্রম করে; সেই অবস্থাকে উহাদের জাগ্রদবস্থা এবং যে সময় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সকল দুর্ব্বল হওয়াতে উহারা নিদ্রিত হয়, সেই অবস্থাকে উহাদের সুপ্তাবস্থা বলা যায়। এক্ষণে এই দুই অবস্থার সহিত জড় রাজ্যের কার্য্যগত কি রূপ ব্যবস্থা আছে, তাহার আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

আমরা দেখিতেছি পৃথিবীতে পর্য্যায়ক্রমে যে দিবা রাত্রি উপস্থিত হইতেছে, ঐ দুই অবস্থার সহিত উহার একটি বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আছে। জীবজন্তু যতক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া পরিশ্রম করিতে পারে, সেই সময়ানুসারে দিবামান এবং যতক্ষণ উহাদের বিশ্রাম-জনিত তৃপ্তি-সুখ লাভ করা আবশ্যক, তদনুসারে রাত্রিমান স্থাপিত হইয়াছে। পরিশ্রম ও বিশ্রামের সহিত দিবা ও রাত্রির সময়-গত এইরূপ ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়াতেই জীবজন্তু-সকল সুস্থ শরীরে কালযাপন করিতেছে। জীবজন্তুর যেমন এক সময় কার্য্যের ও আর এক সময় বিশ্রামের নিমিত্ত আবশ্যক,

উদ্ভিদ্‌জাতিও সেই নিয়মে আবদ্ধ আছে। দিবাভাগে উদ্ভিজ্জের একরূপ ভাব এবং রাত্রিকালে উহার বিপরীত আর এক প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দিবার আলোক ও উত্তাপ এবং রাত্রির ছায়া ও শীতলতা নিয়মিত না হইলে উদ্ভিজ্জের যথেষ্ট হানি জন্মে। যতক্ষণ আলোক ও উত্তাপ উহার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন হয় এবং যতক্ষণ রজনীর নীহার বিন্দু ও ছায়া উহাকে সজীব করিবার নিমিত্ত অপেক্ষিত হইয়া থাকে, সেই সময়ের অণুমাত্র ন্যূনাতিরেক হইলে এই রাজ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। ফলত ঈশ্বর জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের প্রকৃতি অনুসারে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে এক মাত্র তাঁহারই যে শুভাভিপ্রায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর কোন সংসয়ই নাই।

। জীবজন্তুর পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, বিশ্রামও সেইরূপ। ইহার সহিত দিবা রাত্রির কেমন এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। কএক ঘণ্টাকাল পরিশ্রমের নিমিত্ত আলোকের প্রয়োজন হয় এবং কএক ঘণ্টা বিশ্রামের জন্য আলোকের অভাবও আবশ্যক হইয়া থাকে। আলোক ও উহার অভাবের যে একটি কাল নির্দ্দেশ আছে, তাহা অতিশয় নিয়মিত। এক পদও তাহা অগ্রপশ্চাৎ হইবার নহে। কালগত এই নিয়মটি জড় রাজ্যে কেমন অদ্ভুত রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। দেখ আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবী একটি মেরুদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতিনিয়ত সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী ঐ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিক একবার পরি ভ্রমণ করিলে একটি দিবা ও একটি রাত্রি হয়। ইহাকে পৃথিবীর আহ্নিক গতি বলে। এই দিবারাত্রির পরিমাণ চব্বিশ ঘণ্টা। আমরা এক সময়ে সূর্য্যের আলোক ও আর এক সময়ে রজনীর ছায়া যে লাভ করিতেছি, এই আহ্নিক গতিই তাহার কারণ। পৃথিবীর এই ভ্রমণ ক্রিয়াটি এইরূপ নিয়মের অধীন যে, যে পরিমাণে ভ্রমণ করিলে পৃথিবীতে যতক্ষণ আলোক ও উত্তাপ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনা এবং যতক্ষণ এই দুইয়ের অভাব উপযোগী হয়, তাহারও কিছুমাত্র ন্যূনাতিরেক উপস্থিত হয় না। জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের সহিত এই ভ্রমণ-ক্রিয়ার যে কোন একটি বিশেষ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে তাহাও নহে; অথচ যতটুকু ভ্রমণ করিলে দিবার ব্যবস্থা এবং যতটুকু ভ্রমণ করিলে রাত্রির ব্যবস্থা স্থাপিত হয়, তাহারও কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইতেছে না। যখন জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের সহিত দিবা রাত্রির এই রূপ সম্বন্ধ কোন রূপ ভৌতিক ক্রিয়ার অধীন নহে, তখন সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর আমাদিগের মঙ্গলেরই নিমিত্ত যে এই প্রকার নিয়ম করিয়াছেন, তিনি যে এই পৃথিবীকে জীবজন্তুর বাস করিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে কি আর কোন সংশয় থাকে?

যদি বর্ত্তমান নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। মনে কর, যদি দিবা ও রাত্রি-মান বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে পরিশ্রম ও বিশ্রামের একটি ব্যবস্থা করিতে হইত। আমরা দিবসের মধ্যে হয় ত একবার বিশ্রাম করিতাম এবং রাত্রির মধ্যেও হয় ত আমাদিগের পরিশ্রম করিতে হইত। আর যদি দিবামান ও রাত্রিমান বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইত, তাহা হইলেও আমাদিগকে পরিশ্রম ও বিশ্রামের একটি

স্বতন্ত্র নিয়ম করিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমান যে দিবা রাত্রির পরিমাণ আছে, তাহা আমাদের দৈহিক অভাবের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইহা কোন রূপেই অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। ইহা দ্বারাই পৃথিবী যে আধার ও জীবজন্তু যে ইহার আধেয় ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

এক সময়ে কতগুলি নাবিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে উত্তর কেন্দ্রের যে অক্ষাংশে সূর্য্যকে কএক সপ্তাহ দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় তাহাদিগকে ঠিক্ পূর্ব্বাহ্ন ছয়টার সময় পরিশ্রম ও রাত্রি নয়টার সময় বিশ্রামের আবশ্যক হইত। যদিও তথায় দিবা রাত্রির নিয়ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তথাচ তাহারা আপনাদিগের প্রকৃতি অনুসারে দৈনিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করাতে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিল। সুতরাং দৈহিক অভাবের সহিত দিবা রাত্রির পরিমাণ-গত ব্যবস্থা না থাকিলে কখনই এই রূপ ঘটিতে পারে না। জীব জন্তুর ন্যায় উদ্ভিজ্জ রাজ্যেও সময়গত এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কতগুলি পুষ্প নিয়মিত সময়ে বিকসিত ও নিয়মিত সময়ে মুকুলিত হইবেই হইবে। কোন প্রকার পুষ্প প্রাতঃকালে ছয় টার সময় কোনটি সাত টার সময় প্রস্ফুটিত হয় এবং কোনটা অপরাহ্ন ছয় টার ও কোনটা সাত টার সময় মুকুলিত হয়। সূর্য্য-কিরণ যে ইহাদের বিকাশের কারণ তাহাও নহে। একটি অন্ধকারময় গৃহে ঐ জাতীয় বৃক্ষ রোপিত করিয়া প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে যে সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত না হইলেও নিয়মিত সময়ে ইহার পুষ্প বিকসিত ও নিয়মিত সময়ে মুকুলিত হইয়াছে।

কোন ভৌতিক নিয়ম দিবা ও রাত্রির পরিমাণকে জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জের অনুরূপ করিয়া দিতেছে, তাহা কোনরূপেই বোধ হয় না। আমরা এমন কোন ভৌতিক নিয়ম দেখিতে পাই না, যাহা পৃথিবীর দিবারাত্রি-মান ন্যূনাতিরেক হইবার ব্যাঘাত করিতেছে। পৃথিবী একমাসের মধ্যে একবার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিয়া আসিলে একটি দিন রাত্রির সৃষ্টি করিতে পারে। ইহা দ্বারা দিবামান পনর দিবস ও রাত্রিমান পনর দিবস হইবে। আবার এক ঘণ্টার মধ্যে এক বার ঘুরিয়া আসিলে আধ ঘণ্টা দিবা ও আধ ঘণ্টা রাত্রি হইবে। যদিও পৃথিবীর আহ্নিক গতি ভৌতিক নিয়মে এই রূপই হইত, তাহা হইলে জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জের যথেষ্ট ক্ষতি করিত। সুতরাং বর্ত্তমান নিয়ম ঈশ্বরের শুভাভিপ্রায় ভিন্ন কোন ভৌতিক কারণে যে ঘটিয়াছে, তাহা কোন রূপেই বোধ হয় না। যিনি স্বহস্তে এই প্রকাণ্ড জড় পিণ্ডকে অসীম নভোমণ্ডলে পরিভ্রমিত করিতেছেন, তিনিই এই হিতকর নিয়ম স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

যখন দেখিতেছি যে পৃথিবীর বর্ত্তমান আহ্নিক গতি দ্বারা স্থাবর জঙ্গম ভুতগণের অসংখ্য শুভোদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, ইহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম উপস্থিত হইলে সকল বস্তু সংশয়-দশায় উপনীত হয়, তখন সহজেই মনোমধ্যে এই রূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে যে অন্যান্য গ্রহেও এই রূপ ব্যবস্থা আছে কি না? যদি থাকে, তাহা পার্থিব ব্যবস্থার অনুরূপ কি না? আমরা যখন এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, দেখিতে পাই যে, সকল গ্রহেরই আহ্নিক গতি আছে এবং তাহাদের গতি এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, তৎসমুদায়ে নিয়মিত রূপে দিবা রাত্রি উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং আমরা যেমন পৃথিবীতে থাকিয়া এক সময় সূর্য্যের আলোক আর এক সময় রজনীর

অন্ধকার দেখিতেছি, উহাতে অবশ্যই সেই রূপ আছে। কোন কোন গ্রহের দিবামান ও রাত্রিমান যে পৃথিবীরই অনুরূপ তাহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুরবীক্ষণ দ্বারা মঙ্গল গ্রহে প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে এই গ্রহে চন্দ্রের ন্যায় কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ রেখা আছে। যদি স্থিরভাবে ঐ গ্রহে কএক ঘণ্টা কাল দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ রেখা কখন দৃশ্য ও কখন অদৃশ্য হইতে দেখিতে পাই। ইহার কারণ এই যে, ঐ গ্রহটি পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রদক্ষিণ কালে যে পৃষ্ঠ আমাদের সম্মুখে থাকে, তাহার রেখা গুলি ক্ষণকালের নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই; আর সেই পৃষ্ঠটি আমাদের চক্ষের অন্তরাল হইলে আমরা আর কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তাহা দেখিতে পাই না।

এই গ্রহের যে একটি আহ্নিক গতি আছে, ইহা দ্বারাই তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ গ্রহের কৃষ্ণবর্ণ রেখা সকল যে স্থলে এক বার দৃষ্ট হইয়াছিল চব্বিশ ঘণ্টা সাঁইত্রিশ মিনিট ও বাইশ পলের পর পুনরায় সেই স্থলে দেখা গিয়াছে। এই গ্রহের ন্যায় বুধ গ্রহ তেইশ ঘণ্টা একুশ মিনিট ও একুশ পলে এবং শুক্র গ্রহ চব্বিশ ঘণ্টায় যে আহ্নিক গতি সম্পন্ন করিতেছে, ইহারও বিলক্ষণ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই পৃথিবীতে পর্য্যায়ক্রমে দিবা রাত্রি উপস্থিত হইয়া যেমন শুভোদ্দেশ্য সমুদায় সংসাধন করিতেছে, ঐ সমস্ত গ্রহেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। পৃথিবীর দিবা রাত্রির পরিমাণ যেমন অত্রত্য জীব জন্তুর সম্পূর্ণ অনুরূপ হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রহেও তদ্রূপ হইবে। পৃথিবীস্থ জীব জন্তুর পরিশ্রম ও বিশ্রাম যেমন আবশ্যক, ঐ সকল গ্রহেরও তাহার কোন অংশেই ন্যূন হইতে পারে না।

কি উপায়ে গ্রহ সমূহে দিবা ও রাত্রি পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, তাহা আলোচনা করিতে হইলে উহার মেরুদণ্ড কি রূপে আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। পৃথিবী যে মেরুদণ্ডের উপর ভ্রমণ করিতেছে, তাহা কি রূপ ভাবে আছে, ইহা অনুধাবন করিলেই গ্রহ-সমূহের বিষয় বিশদ হইতে পারে। আমরা দেখিতেছি যে, পৃথিবীর মেরুদণ্ড যদি সূর্য্যের দিকে সম্পূর্ণ রূপ দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর সমুদায় অংশেই সম্বৎসর কাল দিবা রাত্রির ভাগ সমান হইবে। আর যদি উহা সূর্য্যাভিমুখে সম্পূর্ণ রূপ শয়ান থাকে, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালের কয়েক সপ্তাহ সূর্য্যকে ঊর্দ্ধে এবং শীত কালে কএক সপ্তাহ নিম্নে থাকিতে হয়। ইহা দ্বারা এই ফল উৎপন্ন হয় যে পৃথিবীর একাংশে নিরবচ্ছিন্ন আলোক ও অপর অংশে কেবল অন্ধকার থাকে। এই রূপ হইলে পৃথিবী জীব জন্তুর বাস করিবার যে একান্ত অনুপযোগী হইত, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি মেরুদণ্ড সূর্য্যের দিকে দণ্ডায়মান থাকিত, তাহা হইলে এই রূপ ঋতু-পরিবর্ত্ত হইত না এবং এক্ষণে যে সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তদ্বিষয়েও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইতাম। মেরুদণ্ডের যে দুই প্রকার অবস্থানের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতিরিক্তও উহাকে অন্য প্রকারে স্থাপন করা যাইতে পারে; তাহাও অধিবাসিদিগের পক্ষে যার পর নাই অসুখকর হয়। কিন্তু ধন্য তাঁহার জ্ঞান! ধন্য তাঁহার কৌশল! যিনি এক কটাক্ষপাতে এই পৃথিবীকে জীব জন্তুর সম্যক্ বাসোপযোগী

করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। এই পৃথিবী যে ভাবে সূর্য্যাভিমুখে স্থাপিত হইয়া অসংখ্য শুভ উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য। পৃথিবীর মেরুদণ্ড সূর্য্যাভিমুখে শয়ান ও দণ্ডায়মানও নহে। উহা এই উভয়ের মধ্যবিধ ভাব অবলম্বন করিয়া সূর্য্যাভিমুখে হেলিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী এই প্রকারে অবস্থিত আছে বলিয়াই আমরা ঋতু পরিবর্ত্ত ভোগ করিতেছি। আবার পৃথিবীর এই প্রবণ ভাব এই রূপ যে, ইহার প্রভাবে যে ঋতুর পর্য্যায় উপস্থিত হয়, তাহা এত কাল স্থায়ী হইবে যে, তদ্দ্বারা জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জের সম্পূর্ণ উপকার দর্শিবে, সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড যে রূপে আছে, মঙ্গল গ্রহের মেরুদণ্ডও সেই রূপ রহিয়াছে। সুতরাং মঙ্গল গ্রহের ঋতু ও জল বায়ু পৃথিবীর অনুরূপই হইবে। বুধ ও শুক্রের মেরুদণ্ড কি রূপ ভাবে আছে, তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণ স্থির হয় নাই; কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় উহা পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মেরুদণ্ড অপেক্ষা বিভিন্ন প্রকার হইবে না। সুতরাং ঐ দুই গ্রহে পৃথিবীর ন্যায় দিবা রাত্রির পরিবর্ত্ত ও ঋতু-পর্য্যায় উপস্থিত হয় এবং পৃথিবীর জলবায়ু যেমন স্থান বিশেষে বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে ঐ দুইটি গ্রহেও ঐ রূপ ব্যবস্থা আছে।

উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসাধন।

এক্ষণে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে তিনি পাপী ব্যক্তিকে উদার দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়া পাপকে কখন উদার দৃষ্টিতে দর্শন করেন না। অন্যের সম্বন্ধে তিনি যেমন উদার, আপনার সম্বন্ধে তিনি তেমনি অনুদার। তিনি আপনার একটু পাপ বা পাপ ইচ্ছার জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হয়েন। অন্য ব্যক্তি যদি সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম সাধন করিতে না পারেন, সে জন্য তিনি মনুষ্যের অপূর্ণতা জানিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করেন না, কিন্তু আপনি ধর্ম্মের পূর্ণভাব আপনাতে আবির্ভূত করিতে না পারিলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েন।

ঈশ্বরের সাধক শান্ত ও শীতল স্বভাব। যে সকল কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য, তাহা তিনি প্রাণ-পণে যত্ন করিয়া সম্পাদন করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজের উগ্রতা বা আড়ম্বর বা আসক্তি কিছুই প্রকাশ পায় না। তিনি স্বার্থপরতা-শূন্য হইয়া, নির্ম্মল বুদ্ধির সহিত ঈশ্বরের অভিপ্রায় গুলি বিবেচনা করেন এবং সরলচিত্তে তাহার সিদ্ধি বিষয়ে প্রাণ-পণে চেষ্টা করেন। তাঁহার শান্ত সমাহিত ও স্নিগ্ধ ভাব দেখিয়া সকলে বিগলিত হয়। ঈশ্বরের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর। তিনি জানেন ঈশ্বর সকলই, তিনি নিজে কিছুই নহে। মনুষ্য কার্য্য করে ইহা যথার্থ বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহার অভ্যন্তরে কার্য্য করেন। পাপ ব্যতীত ঈশ্বর সকল ঘটনাই বিধান করিতেছেন। মনুষ্যের যে কার্য্যের মূলে ঈশ্বরের কার্য্য নাই, তাহা নিষ্ফল হয়। ঈশ্বরের বলই মনুষ্যের বল। অতএব কোন বিষয়ে তাঁহার উদ্বেগ নাই, কোন বিষয়ে তাঁহার ব্যগ্রতা নাই, কোন বিষয়ে তাঁহার আড়ম্বর নাই। তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া চলিয়া যান। তিনি ঈশ্বরের অগ্রসর হইতে চাহেন না। তিনি বীজ বপন করেন কিন্তু শস্যোৎপাদন ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, শেষ সকলই ভাল হইবে। ঈশ্বরের আদেশে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে তিনি কার্য্য করেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। সংসারের আদেশে অথবা সাংসারিক বুদ্ধির উপদেশ অনুসারে তিনি আপনার জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহেন কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত। তিনি সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের অধীন। তিনি অন্য লোকের উৎসাহ দেখিয়া উৎসাহান্বিত হয়েন না এবং অন্য লোকের নিরুৎসাহে নিরুৎসাহ হয়েন না, কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হইতে বল ও উৎসাহ প্রাপ্ত হন। তিনি

সেই শক্তির উপর স্থির ভাবে নির্ভর করেন, অতএব তিনি কোন বিষয়ের লাভ বা কোন বিষয়ের সিদ্ধিতে আপনার বল ঘোষণা কিম্বা আপনার জয় প্রকাশ করেন না। তিনি সকল বিষয়েই ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করেন।

ঈশ্বরের সাধক অতি গম্ভীর-প্রকৃতি। তিনি সর্ব্বদা তদ্গতচিত্ত তদ্গত প্রাণ হইয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বর নিরন্তর বাস করেন, এজন্য তাঁহার ব্যবহারে শূন্য-হৃদয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় লঘুতা দৃষ্ট হয় না। তিনি সর্ব্বদাই স্থিরচিত্ত। তাঁহার অন্তরের সেই গভীর ভাব তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রকাশ পায়। কোন কারণে তিনি চপল ও লঘুচেতা ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করেন না। তিনি সেই "নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবে" সর্ব্বদা নিমগ্ন রহিয়াছেন। সেই সুধার্ণবের গাম্ভীর্য্যের প্রতিচ্ছায়া তাঁহার আত্মাতে পতিত হয়।

THE ABNORMAL PHENOMENA OF THE HUMAN MIND.

There is a great number of facts, widely observed, and many of them unquestionably established, which have never yet taken any place in a regular system of mental analysis, but have been regarded as bearing a purely abnormal character. Amongst these we may reckon, not only some of the more remarkable forms of dreaming, but more especially somnambulism, hallucination, presentiments, mental sympathies and antipathies, hypnotism, clairvoyance, ghost-seeing, and all the varied phenomena of what is now called "mediumship."

With regard to these latter phenomena, they have now become so widely epidemic, both in England and America as almost to demand some share of attention from the mental philosopher. For myself, the facts of the case have been for some years sufficiently intersting to become the object of somewhat close attention. I have had repeated opportunities of witnessing and examining the processes of spirit writing, spirit drawing, and all the other methods by which the denizens of another world are *supposed* to communicate their thoughts through the instrumentality of those now living on earth, and have thus gained ample means of comparing the *results*, with what I conceive to be both the ordinary and the hidden capacities of the human mind. The conclusion, I have drawn from these facts and considerations is to my own mind perfectly unquestionable.

First of all, I must freely confess that the arrogation of mediumship is not generally by any means a wilful deception. Many motives conspire to bring it about. There is the natural credulity of the human mind, which yearns for some sort of intercourse with the world of spirits, and has been the mainspring of endless forms of superstition, ever varying with the race and the age in which they have appeared. There is, next, the prompting of personal vanity, which is flattered by the idea of being made a *special vessel* for spiritual communication, secretly plumes itself upon a kind of superiority supposed to be thus conferred, and in this way prevents the healthy suspicions of delusion which from time to time arise in the mind from having their natural weight, or bringing the intellect back to a sounder state. And more than all this, there are the *startling facts themselves*, of intelligent actions performed, and thoughts and sentiments dictated and expressed, with which the volitional powers have no conscious connection. Such facts, to any one unacquainted with that new chapter of psychology which the investigatiin of the preconscious regions of mind unfolds, must seem strange and inexplicable indeed; and, combined with the other causes just mentioned, naturally enough bring about the entire delusion of which we are speaking. Moreover, I for one am not prepared to deny that all spiritual communication between this state of being and other more developed ones, is impossible. There may perhaps be facts well attested which are not acountable for on any other supposition; and it is but too easy for those who are tending to superstitious views to lay hold of a few really valid facts, and blindly carry out the analogy to cases in which other agencies, wholly different, are at work.

So much for some of the causes which have prompted to the belief in mediumship. With regard, next, to the facts themselves, the immense proportion of them come so manifestly under the category of preconscious and instinctive mental actions, that no one who

has studied this sphere of mind with any degree of accuracy can for a moment fail to recognise them as such. The very beings who are supposed to communicate from the spiritual world are either historical characters, or persons who have had some kind of immediate connexion with the medium, both the one and the other clearly suggested by the mind's own thoughts or wishes. The *material suggested* uniformly coincides with the range of mental idea which the medium himself has cultivated, or been in some way connected with. I have never yet failed to see the stamp of his own individuality upon *every thing* emanating from him as a supposed spiritual dictation. On the contrary, the stamp of the being's individuality, from which the communication is said to come, is either wholly wanting, or is only seen as a faint imitation. Who can believe, that poets who wrote with such freshness, and such harmony of measure on earth, would communicate positive doggerel from the other world? Who can imagine that the lyric taste of a schillar, for example, should sink down in a higher sphere to the most bald and common place versification? O, to turn to another class of phenomena, who could suppose it possible that the great painters of Germany and Italy could guide the pencil of mortal now on earth, to make pictures which do not present a *single glimpse* of thir own native genius, either in design or execution?

If a person has a real poetic vein, no doubt it will produce some thing truly poetical under such spontaneous impulses; if he be a veritable artist, he may draw some thing really fine and noble; if he be a philosopher, he may scatter unconsciously some gems of philosophic thought, and so forth; *but you will never get any thing from any one's inspirations which does not already exist potentially in his mental habits or culture.* I have traced the process of spirit-writing and drawing, from the very first nervous twitches in which it commences up to its more developed form, and venture to affirm that the whole thing is, to the psychologist, as palpably a development of the unconscious form of mental operation, as writing an ordinary letter is the result of our conscious mental activity.

J. D. MORELL.

দুর্ভিক্ষ উপশমের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্ত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত		৭০৮
গোয়ালিয়া হইতে আগত		
এ, মস, ফনর সাহেব	২৫	
মাষ্টর এইচ হপকীন	১৫	
লালা নারায়ণ দাস	৩০	
মিয়া হোসেন আলি	৩০	
রাধাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	২০	
মাখনলাল বসু	৫	
দেবিন দিন	১০	
মহিল সিং	২	
নন্দু সিং	২০	
রাম দিন	১	
মতিলাল সেন	২	
বৃন্দাবন পাল	২	
কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১	
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	
দুর্গাপ্রসাদ	২	
মাতাপ্রসাদ	৪	
বিনায়কলাল	২	
মুনশী দৌলাত রাও	৩	
মুনশী প্রসাদ লাল	৩	
মুনশীমহম্মদ বক্স	৪	
লালা চুনিলাল	৫	
রূপচাঁদ	৪	
মুলচাঁদ	৩	
যদুনাথ চৌধুরি	৬	
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে প্রাপ্ত...	৯৫	
		৩০০
		১০০৮

দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত দশে প্রেরিত।

পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত	৫৫০
সম্প্রতি প্রেরিত	৩০০
	৮৫০
স্থিত	১৫৮
	১০০৮

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের অগ্রহায়ণ মাসের

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৬২৶০
পুস্তকালয়	৫৪৶১৫
যন্ত্রালয়	২৩৪৸১৫
ডাক মাশুল	৮৴০
দান	২৮
দুর্ভিক্ষে দান প্রাপ্ত	৩০০
গচ্ছিত	৪৭৷৷১০
	৭৩৪৸০

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৬৪।১০
পুস্তকালয়	৪২৷৷১৫
যন্ত্রালয়	১৯০৸৶০
ডাক মাশুল	১৯৷৷৶০
মাসিক বেতন	২১৪৷৷৶১০
অনিরূপিত	৪৸৫
আলোকের ব্যয়	২২৸১৫
কাগজ পত্রাদি	১১৷৷৶০
দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত দেশে প্রেরিত	৩০০
গচ্ছিত	৪২৸৴১০
	৯১৪৲৫

আয়	৭৩৪৸০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১৭৴১০
	১০৫১৸৴১০
ব্যয়	৯১৪৲৫
স্থিত	১৩৭৸৴৫

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ৭৷৷০ সাড়ে সাত ঘন্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা

সপ্তত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধ বার সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান আগামী ১১ মাঘের মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা।
সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ২০ পৌষ বৃহস্পতি বার।
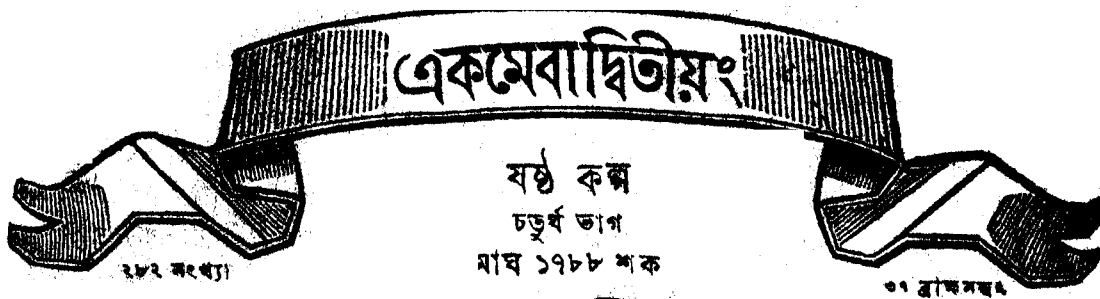
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা

সপ্তত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধ বার সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে

প্রথমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ মরুতোদেবতা।

৯০৫

১। প্র যে শুম্ভন্তে জনয়ো ন সপ্তয়ো যামন্ রুদ্রস্য সূনবঃ সুদংসসঃ। রোদসী হি মরুতশ্চক্রিরে বৃধে মদন্তি বীরা বিদথেষু ঘৃষ্বয়ঃ।

১। 'যে' মরুতঃ 'যামন্' যামনি গমনে নিমিত্তভূতে সতি 'প্র' 'শুম্ভন্তে' প্রকর্ষেণ স্বকীয়ানি অঙ্গানি অলঙ্কুর্ব্বন্তি 'জনয়ঃ' 'ন' জায়া ইব যথা যোষিতঃ স্বকীয়ানি অঙ্গানি অলঙ্কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ। কীদৃশা মরুতঃ 'সপ্তয়ঃ' সর্পণশীলাঃ 'রুদ্রস্য' 'সূনবঃ' রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ তস্য পুত্রাঃ 'সুদংসসঃ' শোভনকর্ম্মাণঃ। এতদেবোপপাদয়তি 'হি' যস্মাৎ 'মরুতঃ' 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'বৃধে' বৃষ্টিপ্রদানাদিনা বর্দ্ধনায় 'চক্রিরে' কৃতবন্তঃ অতঃ সুদংসসঃ ইত্যর্থঃ। 'বীরাঃ' বিশেষেণ শত্রুক্ষেপণশীলাঃ 'ঘৃষ্বয়ঃ' ঘর্ষণশীলাঃ মহীরুহশিলোচ্চয়াদের্ভঞ্জকা ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতাঃ তে মরুতঃ 'বিদথেষু' বিদ[illegible]

যষ্টব্যস্তয়া দেবানিতি বিদথাঃ যজ্ঞাঃ তেষু 'মদন্তি' সোমপানেন হৃষ্যন্তি।

১। যে সমস্ত বায়ু গমন-কালে স্ত্রীলোকের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। যাঁহারা রুদ্রের পুত্র, সাধুকারী ও সঞ্চরণশীল। যাঁহারা বারিবর্ষণাদি দ্বারা ভূলোক ও দ্যুলোকের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সেই সকল বিপক্ষোন্মূলন-সমর্থ বৃক্ষোৎপাটন-পটু বায়ু যজ্ঞে সোম পান দ্বারা পুলকিত হইয়া থাকেন।

৯০৬

২। ত উক্ষিতাসো মহিমানমাশত দিবি রুদ্রাসো অধি চক্রিরে সদঃ। অর্চন্তো অর্কং জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়মধি শ্রিয়ো দধিরে পৃশ্নিমাতরঃ।

২। যে পূর্ব্বোক্তগুণবিশিষ্টাঃ 'তে' মরুতঃ 'উক্ষিতাসঃ' দেবৈঃ অভিষিক্তাঃ সন্তঃ 'মহিমানং' মহত্ত্বং 'আশত' আপ্নুবন্। 'রুদ্রাসঃ' রুদ্রস্য পুত্রাঃ উপচারাৎ জন্যে জনকশব্দঃ। তে রুদ্রপুত্রাঃ মরুতঃ 'দিবি' দ্যোতমানে নভসি 'সদঃ' সদনং স্থানং 'অধিচক্রিরে'। অধিকং সর্ব্বোৎকৃষ্টং কৃতবন্তঃ। 'অর্কং' অর্চনীয়ং ইন্দ্রং 'অর্চন্তঃ' পূজয়ন্তঃ 'ইন্দ্রিয়ং' ইন্দ্রস্য লিঙ্গং বীর্য্যং 'জনয়ন্তঃ' প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্ব ইত্যেবং রূপেণ বাক্যেনোৎপাদয়ন্তঃ 'পৃশ্নিমাতরঃ' পৃশ্নেঃ নানারূপায়াঃ ভূমেঃ পুত্রাঃ মরুতঃ 'শ্রিয়ঃ' ঐশ্বর্য্যাণি 'অধিদধিরে' আধিক্যেন অধারয়ন্।

২। ঐ সমস্ত রুদ্রপুত্র বায়ু দেবগণ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা অন্তরীক্ষে বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁরা পূজনীয় ইন্দ্রের অর্চনা এবং তাঁহার বল উৎপাদন করেন। ইহাঁরা ভূমির পুত্র ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

৯০৭

৩। গোমাতরো যচ্ছুভয়ন্তে অঞ্জিভিস্তনূষু শুভ্রা দধিরে বিরুক্মতঃ। বাধন্তে বিশ্বমভিমাতিনমপ বর্ত্মান্যেষামনু রীয়তে ঘৃতং॥

৩। 'গোমাতরঃ' গোরূপা ভূমিঃ মাতা যেষাং তে মরুতঃ 'অঞ্জিভিঃ' রূপাভিব্যঞ্জকৈঃ আভরণৈঃ 'যৎ' যদা 'শুভয়ন্তে' স্বকীয়ানি অঙ্গানি শোভাযুক্তানি কুর্ব্বন্তি। তদানীং 'শুভ্রাঃ' দীপ্তাঃ মরুতঃ 'তনূষু' স্বকীয়েষু শরীরেষু 'বিরুক্মতঃ' বিশেষেণ রোচমানান্ অলঙ্কারান্ 'দধিরে' ধারয়ন্তি। অপি চ 'বিশ্বং' সর্ব্বং 'অভিমাতিনং' শত্রুং 'অপবাধন্তে' হিংসন্তি 'এষাং' মরুতাং 'বর্ত্মানি' মার্গান্ অনুসৃত্য 'ঘৃতং' ক্ষরণশীলং উদকং 'রীয়তে' স্রবতি। যত্র মরুতো গচ্ছন্তি বৃষ্ট্যুদকমপি তদনুসারেণ তত্র গচ্ছতীত্যর্থঃ।

৩। গোরূপা পৃথিবী এই সমস্ত বায়ুর জননী। ঐ সকল দীপ্তিশীল বায়ু বেশ বিন্যাসের অভিলাষ হইলে সুশোভন উজ্জ্বল অলঙ্কার দ্বারা শরীর সুশোভিত করিয়া থাকেন। ইহাঁরা শত্রুবিনাশক। ইহাঁরা যে স্থানে গমন করেন, তথায় বারি বর্ষণ হয়।

৯০৮

৪। বি যে ভ্রাজন্তে সুমখাস ঋষ্টিভিঃ প্রচ্যাবয়ন্তো অচ্যুতা চিদোজসা। মনোজুবো যন্মরুতো রথেষ্বা বৃষব্রাতাসঃ পৃষতীরযুগ্ধ্বং॥

৪। 'সুমখাসঃ' শোভনযজ্ঞাঃ 'যে' মরুতঃ 'ঋষ্টিভিঃ' আয়ুধৈঃ 'বিভ্রাজন্তে' বিশেষেণ দীপ্যন্তে তে মরুতঃ 'অচ্যুতা চিৎ' চ্যাবয়িতুং অশক্যানি দৃঢ়ানি পর্ব্বতাদীন্যপি 'ওজসা' স্বকীয়েন বলেন 'প্রচ্যাবয়ন্তঃ' প্রকর্ষেণ চ্যাবয়িতারঃ প্রেরয়িতারঃ ভবন্তি। উত্তরার্দ্ধঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। হে 'মরুতঃ' 'মনোজুবঃ' মনোবদ্বেগগতয়ঃ 'বৃষব্রাতাসঃ' বৃষ্ট্যুদকসেচনসমর্থসপ্তসংঘাত্মকাঃ যূয়ং 'রথেষু' আত্মীয়েষু 'পৃষতীঃ' পৃষত্যঃ ইতি মরুদ্বাহনানাং সংজ্ঞাঃ পৃষত্যো মরুতামিত্যুক্তত্বাৎ পৃষদ্ভিঃ শ্বেতবিন্দুভিঃ যুক্তাঃ মৃগীঃ 'যৎ' যদা 'অযুগ্ধ্বং' আভিমুখ্যেন নিযুক্ত অকৃদ্ধং তদানীং পর্ব্বতাদিকং প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ।

৪। বায়ু সকল যজ্ঞশীল, আয়ুধ-ধারী, মনের ন্যায় বেগগামী ও বারি-বর্ষণ-সমর্থ। হে বায়ুগণ! যখন তোমরা মৃগীদিগকে রথে যোজিত কর, তখন স্বীয় বল-প্রভাবে নিশ্চল পর্ব্বতকেও চালিত করিতে সমর্থ হও।

৯৯

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

৫। প্র যদ্রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং বাজে অদ্রিং মরুতো রংহযন্তঃ। উতারুষস্য বিষ্যন্তি ধারাশ্চর্ম্মেবোদভির্ব্যুন্দন্তি ভূম॥

৫ হে মরুতঃ 'পৃষতীঃ' 'যৎ' যদা 'রথেষু' 'প্রাযুগ্ধ্বং' প্রাযুযুজত। কিং কুর্ব্বতঃ 'বাজে' অন্নে নিমিত্তভূতে সতি 'অদ্রিং' মেঘং 'রংহযন্তঃ' বর্ষণার্থং প্রেরযন্তঃ 'উত' তদানীং 'অরুষস্য' আরোচমানস্য সূর্য্যস্য বৈদ্যুতাগ্নের্ব্বা সকাশাৎ বৃষ্ট্যুদকধারাঃ ভবন্তঃ 'বিষ্যন্তি' বিমুঞ্চন্তি। বিমুক্তাঃ তাশ্চ 'ধারাঃ' 'উদভিঃ' উদকৈঃ 'চর্ম্ম' 'ইব' পরিমিতং অল্পং চর্ম্ম যথা অপ্রযাস্নেন ক্লেদ্যতে এবং 'ভূম' সর্ব্বাং ভূমিং 'ব্যুন্দন্তি' বিশেষেণ আর্দ্রাং কুর্ব্বন্তি।

৫। হে বায়ুগণ! তোমরা এক্ষণে মৃগীদিগকে রথে যোজিত কর। তোমরা অন্নের নিমিত্ত মেঘকে বারি বর্ষণে প্রেরণ করিয়া তৎকালে স্বয়ং ভাস্বর সূর্য্য হইতে বারি ধারা নিপাতিত করিয়া থাক। অল্প চর্ম্ম যেমন অনায়াসে আর্দ্র হয়, সেই রূপ ঐ সলিলে সমস্ত ভূমি আর্দ্র হইয়া যায়।

১০০

৬। আ বো বহন্তু সপ্তযো রঘুষ্যদো রঘুপত্বানঃ প্র জিগাত বাহুভিঃ। সীদতা বর্হিরুরু বঃ সদস্কৃতং মাদযধ্বং মরুতো মধ্বো অন্ধসঃ। ১।৬।৯।

৬। হে মরুতঃ 'বঃ' যুষ্মান্ 'সপ্তযঃ' সর্পণশীলাঃ অশ্বাঃ 'আবহন্তু' অস্মৎযজ্ঞং প্রাপযন্তু। কীদৃশাঃ সপ্তযঃ। 'রঘুষ্যদঃ' লঘু শীঘ্রং স্যন্দমানাঃ বেগেন গচ্ছন্তঃ ইত্যর্থঃ। 'রঘুপত্বানঃ' লঘু শীঘ্রং পতন্তঃ গচ্ছন্তঃ যূযং 'বাহুভিঃ' স্বকীযৈঃ হস্তৈঃ অস্মভ্যং দাতব্যং ধনং আহৃত্য 'প্রজিগাত' প্রকর্ষেণ গচ্ছত। হে 'মরুতঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং 'সদঃ' সদনং বেদিলক্ষণং স্থানং 'উরু' বিস্তীর্ণং কৃতং। তত্র যৎ আস্তীর্ণং বর্হিঃ তৎ 'আসীদত' তস্মিন্ বর্হিষি উপবিশত। উপবিশ্যচ 'মধ্বঃ' মধুররসস্য 'অন্ধসঃ' সোমলক্ষণস্য অন্নস্য পানেন 'মাদযধ্বং' তৃপ্তাঃ ভবত। ১।৬।৯।

৬। হে বায়ুগণ! বেগগামী অশ্ব সকল আমাদিগের যজ্ঞের নিকট তোমাকে আনয়ন করুক। তোমরা আগমন-কালে আমাদিগকে দেয় ধন লইয়া আইস। আমরা তোমাদিগের অধিষ্ঠান ভূমি প্রশস্ত করিয়াছি। তোমরা সেই ভূমিতে আস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন করত মধুর সোম রস পান করিয়া তৃপ্ত হও। ১।৬।৯।

উদ্দীপন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

ভ্রাতঃ! আর কত কাল মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে, জাগ্রত হও। তুমি কি দেখিতেছ না সংসারের অসার কামনা তোমার দুর্ব্বল হৃদয়কে কলুষিত এবং দুর্নিবার পাপ করাল আস্য-কুহর বিস্তার করিয়া তোমার আত্মাকে চকিত করিতেছে। সাবধান, তুমি এখনই সেই ভয়-হরণ ত্রিভুবন-নাথের হস্তে আত্ম সমর্পণ কর। বিবেচনা কর যেন, সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, কেবল তুমিই ইহাতে কৃতকার্য্য হও নাই। এক্ষণে তুমি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অনুসন্ধান কর, অবশ্যই দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং তোমার সুললিত সরল প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে তুমি শ্যামল-দুর্ব্বাদল-লাঞ্ছিত প্রান্তরে, কি বিহঙ্গ-কুল-কূজিত নিবিড় অরণ্যে, যে স্থলেই হউক, প্রভাতের সুস্নিগ্ধ-মারুত-হিল্লোলে, কি সন্ধ্যার আরক্ত-সূর্য্য-কিরণে যে সময়েই হউক, অনন্যমনে তাঁহাকে চিন্তা কর, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর-হৃদয়ে এই রূপ প্রার্থনা কর, নাথ! আমি সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমি দেখিতেছি যে, তোমার

একান্ত বশীভূত হওয়াই আমাদের জ্ঞান এবং কায়মনোবাক্যে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই আমাদের সন্তোষ। আমি যখন জানিতেছি যে আমি তোমার ইচ্ছা অনুসন্ধান করি, তুমি কখন্ কি বল, সতর্ক হইয়া শ্রবণ করি, তখন ইহাও জানিতেছি যে, আমি তোমার ভৃত্য, চিরানুগত কিঙ্কর। এই সংসার অতি ভীষণ স্থান; এখানে অন্তরে শত্রু, বাহিরে শত্রু; কিন্তু ইহাও বিশ্বাস করি যে তুমি আমাদিগকে ধূলি-নির্ম্মিত দুর্ব্বল জীব বলিয়া জান। আমরা নিতান্ত ক্ষীণ হীন ও মলিন। এই নিমিত্তই তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং এই নিমিত্তই কাতরতার সহিত কহিতেছি, হে বিশ্ব-জননি! আমি যেন তোমার স্নেহনেত্রের নিকটেই জীবিত থাকি এবং তোমার অলক্ষ্য বক্ষঃস্থলে প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি।

ভ্রাতঃ! তুমি তোমার আত্মার আরামস্থান ঈশ্বরকে নির্জ্জনে পাইয়া এই রূপ বলিবে। তিনি প্রতিক্ষণই তোমার হৃদয়কে পাঠ করিতেছেন এবং প্রতিক্ষণই তোমার অন্ধকারময় গুপ্ত প্রদেশকে অনুসন্ধান করিতেছেন। তুমি তাঁহার অন্তর্ভেদি দৃষ্টির নিকট দণ্ডায়মান থাকিতে কদাচই ভীত হইও না। তুমি তাঁহার জ্বলন্ত চক্ষুর সমক্ষে অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে দণ্ডায়মান্ হইলে উঁহার দুর্ব্বিষহ তেজে তোমার পাপ-রাশি ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। সাংসারিকতা ও অপবিত্রতা লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করিবে এবং তোমার অন্তর্দৃষ্টি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইবে। তখন তুমি জানিতে পারিবে, ঈশ্বরই আমার চির-পরিচিত প্রভু এবং আমি তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য। তুমি ভ্রমেও এই রূপ বিবেচনা করিও না যে আমার আত্মা পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়াছে, ইহা আর কিছুতেই দ্রব হইবার নহে। যখন সেই প্রেম-শশী তোমার হৃদয়াকাশে উদিত হইবেন, তখন তোমার এই দুর্ভেদ্য আত্মাও আর্দ্র হইয়া যাইবে। তাঁহার করস্পর্শে ইহা হইতে শোক সন্তাপ অপনীত ও সুখশান্তি অঙ্কুরিত হইবে। যাঁহারা পবিত্র-হৃদয়ে তাঁহাকে প্রীতি করেন, তিনি সেই সমস্ত সাধুদিগের সমক্ষে প্রীতির অনন্ত উৎস হইয়া বিরাজমান থাকেন। আমরা কখন্ তাঁহাকে আহ্বান করি, তন্নিমিত্ত তিনি সততই অপেক্ষা করিতেছেন, আমরা কখন তাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করি, তন্নিমিত্ত তিনি সততই প্রস্তুত হইয়া আছেন। অনুরক্ত ভক্তকে তাঁহার অদেয় কিছুই নাই, তিনি সময়ে সময়ে আপনাকে দিয়াও আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

ভ্রাতঃ! জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন কর। অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র-পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলে, জলজন্তু-বিলোড়িত সাগর-সলিলে, বৃক্ষের শ্যামল পত্রে, পক্ষীর সুচিক্কণ পতত্রে, নবকুসুমিত মনোহর উদ্যানে, তৃণ-গুল্ম-সঙ্কুল গভীর কাননে, উত্তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গে, দুর্লক্ষ্য কীটের সুশোভন অঙ্গে, তাঁহারই সৌন্দর্য্য। রজনীর মোহন-মূর্ত্তি চন্দ্রে, দিবসের উদয়াচল-চক্রবর্ত্তী তরুণ সূর্য্যে তাঁহারই মুখরাগ। গিরি-শিখরোপরি নিপতিত ধবল তুষার-শিলায় ও স্রোতস্বতীর লহরী-লীলায় তাঁহারই শোভা। পতিব্রতা ভার্য্যার মুগ্ধমধুর হাস্যে তাঁহারই উল্লাস এবং পবিত্র স্বভাব ভর্ত্তার হৃদয়ে তাঁহারই বিলাস। জগতের যা কিছু সৌন্দর্য্য যা কিছু ভাব সকলই তাঁহার।

থিওডোর পার্কর।

২৮১ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৯ পৃষ্ঠার পর।

যে জাতি পুরুষোপাসনার মত অবলম্বন করিয়াছে, দেবত্ব-সম্পন্ন মনুষ্যই তাহাদিগের উপাস্য। এই জাতীয়েরা বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালের মনুষ্য-সমূহের কার্য্য এক মনুষ্যের বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্ব কালে কৃষি বাণিজ্যাদির সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, পরিশেষে তাঁহারাই মনুষ্য-সমাজে দেবতা বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন। যে সমস্ত লোক জীবিতাবস্থায় জ্ঞানবত্ত্ব মহত্ত্ব ও সাধুত্ব নিবন্ধন জন-সমাজে সম্মান লাভ করিতেন, লোকান্তরিত হইলে তাঁহাদিগকেই দেবত্ব প্রদান করা হইত। লোকে এই রূপ বিবেচনা করে যে ঐ সমস্ত মহাত্মা এক সময়ে যেমন জীবিত ব্যক্তি দিগকে শাসন করিয়াছিলেন, এক্ষণে লোকান্তরিত ব্যক্তিদিগকেও সেই রূপ শাসন করিতেছেন। ইহাঁরা জীবিতাবস্থায় যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যে গুলি প্রশংসা ও গৌরবের, তাহাই লোকের মনে জাগরূক থাকে, আর যে গুলি অপ্রশংসনীয় ও অনুদার, তৎসমুদায় তাঁহাদিগেরই সহিত পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করে। মনুষ্যেরা ইহাঁদিগের প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। যিনি প্রথমে মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তিনিই দেবতা-বোধে পূজিত হন। জড়োপাসকদিগের দেবতার গুণ ও প্রকৃতির শক্তি এই সমস্ত মনুষ্য-দেবতাদিগের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। যে মনুষ্য মহাবল পরাক্রান্ত ছিল, তাহাকে দেবত্ব প্রদান কালে তাহার হস্ত পদ ও মস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। এই জাতি দিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সমস্ত দেবতার অপূর্ণ ভাব ক্রমশ সাধারণকে পূর্ণ ভাবের আস্বাদনে সমর্থ করিয়াছে এবং অপূর্ণ মনুষ্য-দেবতারা পূর্ণ ঈশ্বরের অনুগত কিঙ্কর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ঐ সময়েই একেশ্বরোপাসনার মত মনুষ্য-সমাজে প্রবেশ করিবার প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মের যে অংশে দোষ দর্শন হইয়া থাকে, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন এবং যাহা প্রকৃত সত্য, তাহা প্রচার করিতে যত্নবান্ হন। কিন্তু তাঁহারা এই সুমহৎ কার্য্য সাধনে অধ্যবসায়ারূঢ় হইলে তাঁহাদিগকে যার পর নাই লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কেহ দেশান্তরিত, কেহ বা বিবিধোপায়ে নিহত হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য মহাত্মা আরিষ্টটলের সহিত নিস্তব্ধ আনেক্সেগোরসের সহিত দেশান্তরিত এবং জগদ্বিখ্যাত সক্রেটিসের সহিত নিহত হয় নাই। যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই সত্যের প্রবল বিপক্ষ ছিলেন, সত্য তাঁহাদিগেরই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাঁহাদের বংশীয়েরাই ঐ সমস্ত নিহত মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। ফলত সত্য অবসর প্রাপ্ত হইলে কদাচই প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না।

পুরুষোপাসনায় পৌরোহিত্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই পৌরোহিত্য ভারতবর্ষ ও ইজিপ্ট দেশে স্বতন্ত্র শ্রেণিভুক্ত ও বংশপরম্পরাগত হইয়া জাতি ও জাতিগত কার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, কিন্তু গ্রিশ দেশে ঐ রূপ দৃষ্ট হয় না। ঐ দেশে এই প্রকার স্বাধীন ভাবই ভাবী উন্নতির সোপান হয়। আমাদিগের বোধ হয় পৃথিবীর আদিমাবস্থাতে যেমন পৈতৃক ধনে পুত্র পৌত্রাদির অধিকার ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে, ধর্ম্ম-যাজকের কার্য্যেও তদ্রূপ ছিল। এই পুরো-

হিত-শ্রেণী সাংসারিক কার্য্যে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দেবগণের ভাব পরিজ্ঞানে নিযুক্ত থাকিতেন। এই অবস্থাতেই শিক্ষিতের একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারাই মানবজাতির উন্নত অভাব সকল উদ্ভাবন করিয়া দেন। দেবগণের ভাব পরিজ্ঞানে যত্নই ইহাঁদিগকে প্রকৃতির অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করে। সুতরাং এই উপায়েই বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। ঐ সমস্ত পুরোহিত দেবতাদিগের সন্তোষ সাধনের উদ্দেশে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ এবং গীত বাদ্য ও কাব্য প্রভৃতি সুকুমার বিদ্যার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে লোকের অভিরুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইজিপ্ট দেশে ধর্ম্মযাজকেরাই জাতির প্রথা সংস্থাপন ও ভয়ানক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রিশ দেশে উৎপীড়নের ভাব প্রায়ই ছিল না। ইতর সাধারণ সকলেই অনেকাংশে আপনাদিগের স্বাধীনতার অব্যাঘাতে কার্য্য করিতে পারিত। যখন এই পুরোহিতের অধিকার একটি স্বতন্ত্র শ্রেণিভুক্ত ছিল, তখন ইহার প্রভাবে জনসমাজের বহুতর অনিষ্ট সাধিত হয়। কিন্তু যখন ইহা কোন শ্রেণীতে আবদ্ধ ছিল না, তখন ইহার গুণে কোন কোন জাতির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এই বহু দেবদেবীর উপাসনা-কালে যুদ্ধ মানবজাতির একটি স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এই অবস্থায় ধর্ম্ম এক জাতীয় মনুষ্যকে এক প্রীতি-সূত্রে বদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক ব্যক্তিকে আর একটি ব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে। দেবতারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী ছিলেন। জিহোবা ও বল দেব কখনই ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাঁদের উপাসকেরাও নির্দ্দয় ভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি যার পর নাই অত্যাচার করিত। কিন্তু এই যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা জন-সমাজে সভ্যতা প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল। এক্ষণকার বাণিজ্যের ন্যায় পূর্ব্বকালের যুদ্ধ বিলক্ষণ স্বার্থ সাধন করিত। যুদ্ধই একটি জাতির সৌভাগ্য বর্দ্ধনের প্রধান সোপান হইয়াছিল। পরাজিতেরা জেতৃজাতিদিগের অধিকারভুক্ত হইয়া উহাদের উৎকৃষ্ট শিল্প সাহিত্য ও রুচির আচার ব্যবহারের অংশভাগী হইত এবং আপনাদিগের যা কিছু উৎকর্ষ, তদ্দ্বারা উহাদিগকে উন্নত করিয়া দিত। এক সময়ে গ্রিশ দেশীয়েরা রোমকদিগের নিকট পরাজিত হইয়া উহাদিগকে শিল্প ও পদার্থ বিদ্যার সম্পূর্ণ অধিকারী করিয়াছিল এবং নির্ব্বাসিত ইহুদীরা বাবিলোনিয়দিগের নিকট অধ্যাত্ম বিদ্যার শিক্ষা লাভ করে। গথ দেশীয়েরা রোমকদিগকে পরাজয় করিয়াছিল কিন্তু রোমকদিগের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ঐ জাতির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করে। যখন ধর্ম্ম, ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত মিলিত হয়, তখনই যুদ্ধের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নর-শোণিত-লোলুপ যুদ্ধই আবার মানবজাতিকে বিজ্ঞানের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিন্তু যখন মনুষ্যজাতি বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণতর আলোকে সত্যের উজ্জ্বল মুখ নিরীক্ষণ করে, তখন রক্তপাত একটি ভয়ঙ্কর পাপ বলিয়া তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন যুদ্ধ স্বহস্তেই আপনার সমাধি-স্থান প্রস্তুত করে এবং স্ফূর্তির শক্তি সংহার শক্তিকে এক কালে উন্মূলিত করিয়া দেয়।

এই সম্প্রদায়ে দেবতা-সংক্রান্ত যুদ্ধই প্রায় উপস্থিত হইত। এই অবস্থায় বীরগণের শারীরিক শক্তি এবং ধর্ম্মযাজক-

দিগের চিন্তা-শক্তি জন-সমাজের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল। বিজিত ব্যক্তিরা বিপক্ষের অধীনতা স্বীকার করিলে তাহাদিগকে আর বধ-দণ্ড প্রদান করা হইত না। এই রূপে দাসত্বের সৃষ্টি হয়। জেতৃ জাতীয়েরা বন্দীদিগকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে। জড়োপাসনা-কালে বন্দিগণের যে রূপ অবস্থা ছিল, পুরুষোপাসনা-কালে তাহার সম্যক্ পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয়। কিন্তু বলিতে কি ধর্ম্ম-সংস্কারের সহিত লোকের অন্তঃকরণে যে এই রূপ করুণভাব সঞ্চার হইতে বহু কাল অতীত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যদি সমাজ-মধ্যে এই রূপ পরিবর্ত্ত না হইত, বোধ হয়, তাহা হইলে মানবজাতি এত দিন সম্পূর্ণ উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। সুতরাং দাসত্ব প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া সমাজের যে যথেষ্ট শুভ সাধন করিয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা দ্বারা আর একটি উপকার হয় এই যে, যে সমস্ত অসভ্য জাতি পরিশ্রমে যৎপরোনাস্তি কাতর ছিল, বিপক্ষের হস্তগত হইয়া তাহাদিগকে অগত্যা আলস্য পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং রীতিমত পরিশ্রমের আবশ্যকতা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া উঠে; ইহা দ্বারা জাতিসাধারণের প্রকৃত উন্নতি অলক্ষিত ভাবে আস্পদ লাভ করে। এই রূপে দাসত্ব-প্রথা জন-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আর এক প্রকার অভিনব ভাব আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু যখন সভ্যতার অপেক্ষাকৃত উন্নতি সহকারে একেশ্বরোপাসনা প্রবর্ত্তিত ও লোকের স্বার্থপরতা অনেকাংশে তিরোহিত হয়, তখন এই ঘৃণিত কুপ্রথা প্রীতিকর বলিয়া আর বোধ হয় নাই। যাহাই হউক, যখন দাসত্বের নিয়ম প্রচলিত হয়, তখন কি ধর্ম্মযাজক কি যোদ্ধা সকলেই ইহা যত্নের সহিত পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা শত্রুর আয়ত্ত ও দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইত, তাহারা যোদ্ধাদিগের অপেক্ষা ধর্ম্ম-যাজক-শ্রেণী হইতেই অধিক পীড়ন সহ্য করিত। ধর্ম্মযাজকেরা ঐ সমস্ত বিজিতদিগের আত্মাকে আপনাদের চিরানুগত কিঙ্কর করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদিগের এই রূপ নির্দ্দয় ব্যবহারে বোধ হইত যেন তাঁহারা আপনার ভিন্ন অন্যের প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বিবেচনা করিতেন। যিনি এই সমস্ত হতভাগ্যদিগকে রণক্ষেত্র হইতে বন্দী রূপে আনয়ন করেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে পুরোহিতেরা প্রথমাবস্থায় উহাদিগকে ঐ মৃত দেহের সহিত সমাহিত বা চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিত। কিন্তু শেষাবস্থায় প্রভুর মৃত্যুর পর উহাদিগকে দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করা হইত।

এই সম্প্রদায়ে ধর্ম্মযাজকদিগের বিশেষ কার্য্য এই যে, ইহাঁরা ধর্ম্মের ব্যবস্থা প্রদান করিতেন কিন্তু ঐ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহার বিচারে অন্যের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া রাখিতেন। এই শ্রেণী কেবল চিন্তা ও কল্পনাতেই কালক্ষেপ করিতেন। আর যোদ্ধার শ্রেণীকে কেবল কার্য্যানুষ্ঠানেই নিযুক্ত থাকিতে হইত। অতি প্রাচীন কালে শাসনের ভার পুরোহিতদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। দেবগণের সহিত এই পুরোহিতদিগের সংযোগ ছিল। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, মাইনস্ মোজেস্ প্রভৃতি কএক ব্যক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতেই নিয়ম প্রণালী অধিকার করিয়াছিলেন। যদি ইহাদিগকে কেহ অসম্মান করিত, তাহাকে বজ্রধর দেবতার ক্রোধের ফল ভোগ করিতে হইত।

গ্রিশ দেশে ইহার বিপরীতও দৃষ্ট হয়। যখন মহাকবি হোমর জীবিত ছিলেন, সেই সময় হইতে বহু দিবস ধর্ম্ম-যাজন শক্তি রাজ্য-

শাসন শক্তি অপেক্ষা গৌরবের বলিয়া বিবেচিত হইত না। তৎকালে মনুষ্যদিগের প্রবৃত্তি অন্যরূপ হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে এমন কতক গুলি লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগকে রাজ্য শাসন, যুদ্ধ ও পৌরোহিত্য কিছুই করিতে হইত না। তাঁহারা দার্শনিক। তাঁহারা বিজ্ঞানেরই সমধিক আলোচনা করিতেন। যদিও তাঁহারা ধর্ম্মযাজকের পদ রীতিমত গ্রহণ করেন নাই, তথাচ তাঁহাদিগের দ্বারা অধ্যাত্ম বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু যে দেশে এক ব্যক্তির হস্তে সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক ভার অর্পিত হয়, তথায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথায় বিদ্রোহ ব্যতিরেকে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। যে সমস্ত বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে, তাহার কিছু মাত্র উন্নতি হয় না। এই প্রথা যে মানব-সমাজের তাদৃশ প্রীতিকর ছিল না, তাহাও সপ্রমাণ হইতে পারে। ইহুদিদিগের মধ্যে সামুএলের ইতিহাসই ইহার একটি নিদর্শন। দেশস্থ ব্যক্তিরা পুরোহিতের শ্রেণীকে ক্ষমতা বিহীন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু ঐ শ্রেণী তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করেন। পরিশেষে যখন পুরোহিতেরা দেখিলেন যে, তাঁহারদের প্রভুত্ব আর কিছুতেই রক্ষা হয় না, তখন তাঁহারা এক ব্যক্তিকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ভাজন এই ভান করিয়া রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া ছিলেন। ঐ ব্যক্তি পুরোহিতের আদেশানুসারেই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিত। যাহাই হউক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে সাংসারিক ভার পুরোহিতের শ্রেণী হইতে আচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা যে অনেক স্থলেই হইয়া ছিল, তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রণালী বহুকাল মনুষ্য সমাজে বর্ত্তমান ছিল। ঐ সময়ে ইহার প্রভাবে জনসমাজেরও বিলক্ষণ অনিষ্টোৎপত্তি হয়।

জড়োপাসনায় যেমন পশুপক্ষীকে দেবত্ব প্রদান করা হইত, পুরুষোপাসনায় সেইরূপ মনুষ্যে দৈবশক্তির আরোপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা মনুষ্য-সমাজে মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত হইতেন, লোকে বিশ্বাস করিত যে, তাঁহারা দেহান্তে চির-যৌবন সম্পন্ন হইয়া অমরগণের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক রাজদণ্ড গ্রহণ করিবেন। যে আত্মা আশ্রয়-ক্ষেত্র দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারও পৃথিবীস্থ মনুষ্যের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। ঐ আত্মা মনুষ্যের অভিভাবক হইয়া মনুষ্যের নানা প্রকার শুভ সাধন করিয়া থাকে। অসভ্যাবস্থার কথা দূরে থাকুক, সভ্যতার অবস্থাতেও এই বিশ্বাস লোকের অন্তঃকরণ-বৃত্তি আকর্ষণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থাতেও এই রূপ মহাপুরুষ ঈশ্বরের আত্মজ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার জন্ম অলৌকিক, তাঁহার শক্তিও অলৌকিক। তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার। তিনিই এক জন মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ। এই রূপ ভাব খৃষ্ট ধর্ম্মের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা স্বাধীনতার সহিত নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন, ইহা তাঁহাদিগকে কখনই আকর্ষণ করিতে পারে না। এক জন মনুষ্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা যার পর নাই অসঙ্গত। বুদ্ধি-বৃত্তি বিচার শক্তি নিতান্ত কলুষিত না হইলে খৃষ্ট ধর্ম্মের এই বিশ্বাসে কখনই অনুমোদন করা যাইতে পারে না।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৩ পৃষ্ঠার পর।

বেদের কাল-নিরূপণ বিষয়ে পুরাণ ও বীর-চরিত-পূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রমাণ-স্থল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। মহর্ষি মনু-প্রণীত মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রও ইহার একটি নিরপেক্ষ প্রমাণ নহে। আমরা দেখিতে পাই যে, যিনি এই ধর্ম্ম শাস্ত্র সঙ্কলন করেন, বৈদিক গ্রন্থ সকল তাঁহার বিলক্ষণ আয়ত্ত ছিল। এই ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এমন অনেক শ্লোক আছে যে, তাহা ব্রাহ্মণ ও সূত্রের স্থান বিশেষের অনুবাদ বৈ আর কিছুই নহে। বৈদিক কালের পর যে সমস্ত সামাজিক নিয়ম স্থির হইয়াছিল, ঐ গ্রন্থে তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ-সমূহের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও এই ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রাচীনত্বে সম্যক্ অনুমোদন করিয়াছেন। কোন পুরাবৃত্ত-লেখকই ইহাকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। ফলত এই গ্রন্থ অতিশয় প্রাচীন, কিন্তু মহাত্মা উইলিয়ম জোন্স্ এই গ্রন্থ প্রণয়নের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না এবং অন্যান্য সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও এই বিষয় যে রূপ স্থির করেন, তাহাও তাদৃশ যুক্তি-সঙ্গত ও প্রামাণিক নহে। তাঁহারা যে রূপ প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ইহার কাল নির্দ্ধারিত করুন কিন্তু কেহই খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ৮৮০ হইতে ১২৮০ শতাব্দির অধিক অগ্রসর হন নাই।

মনু ও মহাভারত যে সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা যদি সম্যক্ নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে বেদের কাল-নির্দ্ধারণ বিষয়ে আর কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। মনু ও মহাভারত অপেক্ষা বেদ বহু কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে। মহাভারতের মধ্যে কতক অংশ বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বে যে রচিত হয় এবং কতক গুলি যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস হউক বা নাই হউক, কিন্তু যে মহাভারত ও মনুর প্রণয়ন-কাল নিরূপিত হয় নাই, বেদ সেই দুই খানি গ্রন্থ অপেক্ষা বহু কাল পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে, এই কথা বলিলে বেদের কাল নির্দ্ধারণ বিষয়ে বিশেষ কি উপকার হইল। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদিগকে একটি স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিতে হইতেছে। যাহা ভারতবর্ষীয় সমস্ত পুরাবৃত্তের মূল, সেই বেদের প্রণয়ন-কাল নিরূপণে যত্ন করিতে হইলে, বেদের পরে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার উপর নির্ভর না করিয়া বৈদিক কাল নিরূপণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। যদি বেদের কাল নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে বেদের সহিত বৈদিক কালের পরে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহাদের একটি সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বৈদিক কালের প্রমাণ বেদই এবং বেদের পরে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের সহিত উহার সম্বন্ধ এই যে, বেদের শাসনেই উহারা শাসিত হইতেছে। উহাদের দ্বারা বেদের কোন বিশেষ সাহায্য হইতে পারে না।

বেদ হইতে দুইটি উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। ইহার সাহায্যে সমস্ত ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর পুরাবৃত্ত অবগত হওয়া যায়। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত বিষয়ে বেদে যাহা উল্লেখ নাই, তাহা অন্য কোন ভাষা প্রদান করিতে পারে না। যে সময়ের বৃত্তান্ত কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না, যে সময়ের আচার ব্যবহারাদি অনুমান দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়, বেদ সেই সমস্ত অভাব মোচন করিতেছে। অত-

এব যদি কেহ মানবজাতির পুরাবৃত্ত জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ প্রাচীন কালের কোন গ্রন্থ পুস্তকালয় ও চিত্রশালিকায় সংস্থাপনের অভিলাষ করেন, তাহা হইলে ঋগ্বেদকেই তাঁহার লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ফলত ইহা অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। ঋগ্বেদই সকল গ্রন্থ অপেক্ষা এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বেদ হইতেই অনেকাংশ উপলব্ধ হইতে পারে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে এমন কোন সংস্কৃত গ্রন্থ নাই, যাহা দ্বারা পুরাবৃত্ত পরিজ্ঞানের বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। এই বাক্যটি নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। এক্ষণে সংস্কৃত ভাষাকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহাতে অনায়াসেই এই কুসংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে পারে; কিন্তু যিনি অনুসন্ধানকে সহায় করিয়া এই ভাষাকে মন্থন করেন, তাঁহার মুখ দিয়া এই বাক্য কদাচই নির্গত হইতে পারে না।

আমরা মহাকবি বাল্মীকি ও ব্যাসের সরল সুমধুর কবিতা সকল পাঠ করিয়া প্রীত হই; কবি-কেশরী কালিদাসের স্বভাবোক্তি-পরিপূর্ণ গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া যার পর নাই আনন্দ অনুভব করি এবং ভবভূতির ভাব-গর্ভ প্রগাঢ় রচনা আমাদের কর্ণ-কুহরে মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে ইহা যথার্থ, মহর্ষি কপিলের দর্শন শাস্ত্র আমাদিগের চিত্ত মোহিত করিয়া থাকে ইহাও সত্য; কিন্তু এই সমস্ত ও অন্যান্য অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ কোন্ সময়ে কি উদ্দেশে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বারা তৎকালে সমাজের কি পর্য্যন্ত উপকার সাধিত হয়, যখন ইহা জানিতে না পারিতেছি, তখন সিসিরো ও ইস্কাইলস-প্রণীত গ্রন্থের ন্যায় তৎসমুদায় আমাদিগকে সম্পূর্ণ আকর্ষণ করিতে পারে না। মনুষ্যের স্বভাবই এই যে, যদি কেহ ভূতপূর্ব্ব কোন মনুষ্যের মস্তক ভূ-গর্ভে পায় এবং ঐ মনুষ্য হইতে যদি মানবজাতির কিছু মাত্র উন্নতি হইয়া থাকে ইতিহাসে তাহার অণুমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ মস্তককে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করে, কিন্তু যাঁহার যত্নে পৃথিবীর ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, ইতিহাসে যদি তাঁহার বিষয় কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে কেহই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

অন্যান্য জাতির যে সমস্ত ইতিবৃত্ত আছে, তৎসমুদায় প্রস্তুত হইবার কাল যেমন নিঃসংশয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বেদের সে রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ যে একটি আদিম ইতিহাস এবং ইহার চারি কল্পের যে একটি বাস্তবিক আনুপূর্ব্বিকতা আছে, তাহা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করাযাইতে পারে। এক্ষণে এই সমস্ত গ্রন্থকে যদি শ্রেণীবদ্ধ করা যায় এবং বেদ যে এক খানি আদিম ইতিহাস, তাহা যদি সপ্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলে ভারতবর্ষে প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব আছে বলিয়া যে এক অমূলক কিম্বদন্তী আছে, তাহা উন্মূলিত হয়, সন্দেহ নাই।

বেদের পর যে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যদিও তৎসমুদায়ের সৃষ্টি-কাল নির্দ্দিষ্ট নাই, তথাচ ঐ সকল গ্রন্থ যে এক দিনেই প্রস্তুত হইয়াছে, পূর্ব্বে যে, উহাদের কোন চিহ্নই ছিল না, বৈদিক প্রমাণানুসারে এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা দেখিতেছি যে, সকল গ্রন্থই বেদকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র যদিও আদি কালের কোন ঋষি দ্বারা প্রণীত হয় নাই,

এই রূপ স্বীকার কর, তথাচ যাঁহাকে বহুকালাবধি ব্যবস্থাপকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল, এই গ্রন্থ এমন এক ব্যক্তি যে প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যে সময় সংস্কৃত ভাষার অসম্ভাবিত উন্নতি হইয়াছিল, শকুন্তলা ও বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটক যদিও সে সময়ে প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু যে সময়ে সংস্কৃত ভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইতেছিল, সেই সময়ে যে প্রস্তুত হয়, তাহাতে আর কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। যাহাই হউক, যদিও এই সমস্ত গ্রন্থের প্রাচীনত্বে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু যাহা পৃথিবীর পুরাবৃত্তের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছে, যাঁহারা পৃথিবীর পূর্ব্বতন মনুষ্যের উৎকর্ষ পরিজ্ঞানে উৎসুক হইয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে যে গ্রন্থ তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করে, সেই বেদের প্রাচীনত্বে কাহারই সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু যে গ্রন্থ জেন্দাভেস্তা ও হোমর অপেক্ষা প্রাচীন, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের সেই গ্রন্থ প্রায় তিন সহস্র বৎসর পরে সম্পূর্ণ কলেবরে যে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাও বিশ্বাস করা সুকঠিন। যাহা এত প্রাচীন, তাহা অবশ্যই ক্ষয়োন্মুখ হয়, কিন্তু সেই ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা হইতে এই গ্রন্থকে রক্ষা করিয়া ইহার যে আকার খৃষ্টিয় শকের প্রায় ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ছিল, সম্পূর্ণ সেই আকারে যে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করাও নিতান্ত সুকঠিন। হোমরের পূর্ব্বে লোকের কবিত্বের ভাব দৃষ্ট হয় না; কিন্তু যে বেদ লাইকরগসের সময়ে ছিল, তাহাতে কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং যে সময়ে জড়োপাসনার পরিবর্ত্তে দেবদেবীর উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, হোমরের পূর্ব্ব সেই সময়ে যে এই রূপ কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করাও সুকঠিন। যাহাই হউক, যে গ্রন্থ বহুকালাবধি এই রূপ আশ্চর্য্য প্রকারে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার বিষয় অনুসন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য এবং পূর্ব্বতন মনুষ্যেরা ইহাতে যে রূপ আত্মমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সঙ্কলন করাও আমাদের কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞান।

২৮০ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৯ পৃষ্ঠার পর।

যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহার সহিত জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যে শ্রেণী নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীবনী শক্তি অধিকার করিতেছে, তাহাদের ত কোন কথাই নাই, কিন্তু যে উদ্ভিজ্জ জীব-শ্রেণীর সমধর্ম্মী নহে, বায়ু তাহারও বিশেষ উপযোগী। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহন-রূপ কার্য্য ব্যতিরেকে বায়ুর আরও কএকটি বিষয়ে সবিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে। আমরা যে শব্দ গ্রহণ করিতেছি, বায়ুই তাহার কারণ। আমরা যখন পরস্পর উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করি, তখন বায়ু বার্ত্তা-হারকের ন্যায় পরস্পরের বাক্য পরস্পরের কর্ণে বহন করিয়া থাকে। আবার আমরা যে বাক্য প্রয়োগে সমর্থ হইতেছি, ইহাতেও বায়ুর সম্পূর্ণ সহকারিতা দৃষ্ট হয়। যদি বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের কর্ণ ও বাক্‌যন্ত্র থাকিলেও আমরা মূক ও বধির হইয়া থাকিতাম। বায়ুর আর একটি গুণ আছে। ইহা সূর্য্যের আলোক সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। যদি এই বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে যে স্থলে সমসূত্রপাতে সূর্য্যের আলোক পতিত হইতেছে, সেই সমস্ত স্থানই প্রকাশিত হইত, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থান ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন

হইয়া থাকিত। আমরা যে স্থান হইতে সূর্য্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম, তথায় আলোক, আর যে স্থলে সূর্য্য অপ্রত্যক্ষ থাকিত, তথায় দুর্ভেদ্য অন্ধকার থাকিত। সুতরাং যে স্থলে দিবা তাহার একটু অন্তরে রাত্রির ভাব সহজেই দেখিতে পাইতাম। বায়ুর আর একটি শক্তি এই যে, ইহা আলোক ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, এই নিমিত্ত সূর্য্য অস্তমিত ও অদৃশ্য হইলেও ক্ষণ কাল পৃথিবীতে আলোক লাভ করা যায়। এই বায়ুর গুণেই মেঘ উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর নানা প্রকার শুভ সংসাধিত হইয়া থাকে।

আমরা অন্তরীক্ষে দৃষ্টি পাত করিলে দেখিতে পাই যেন একখানি নীলবর্ণের চন্দ্রাতপ অবনীরূপ অতি বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে লম্বিত রহিয়াছে। ঐ নীলবর্ণটি বায়ুর, বায়ুর আধিক্যই ঐ রূপ বর্ণানুভবের কারণ। আমরা যে গৃহে বাস করিয়া থাকি, তাহাতে যে পরিমাণে বায়ু থাকিলে ঐরূপ বর্ণানুভব হয়, তাহা নাই, এই নিমিত্ত ঐ নীলিমা গৃহমধ্যে প্রত্যক্ষ হয় না। যিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন, তিনি এই বিষয়টি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সমুদ্র হইতে এক পাত্র-জল লইলে তাহার কোন বর্ণই প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু যে সলিলরাশি সুগভীর সাগরের বক্ষঃস্থলে পোষিত হইতেছে, তাহার বর্ণ অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয়। যদি নভোমণ্ডলে বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে উহা নিবিড় অন্ধকারে নিরন্তর আচ্ছন্ন দৃষ্ট হইত।

এই বায়ু হইতে যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য প্রাকৃতিক কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে, তৎ সমুদায় উদ্ভিদ-রাজ্য ও জীব-শ্রেণীর সম্পূর্ণ আবশ্যক। সূর্য্য ও পৃথিবী হইতে যে তেজ উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু কর্ত্তৃক রক্ষিত ও সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়া থাকে। যদি বায়ু না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর কি শোচনীয় অবস্থাই ঘটিত। ইহার ঐকান্তিক অসদ্ভাবের কথা দূরে থাকুক, যদি ইহার পরিমাণ এক্ষণকার অপেক্ষা ন্যূন হইত, তাহা হইলেও পৃথিবীতে বৃক্ষ লতাদি কিছুই উৎপন্ন হইত না। ভূমির যত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে, বায়ুর ঘনত্ব ততই অল্প অনুভূত হইতে থাকিবে। ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, ভূমি হইতে চতুর্দ্দশ সহস্র ফীট ঊর্দ্ধে জলের তরলতা থাকিতে পারে না। হিমালয় প্রভৃতি অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশ যে নিরবচ্ছিন্ন তুষার-শিলায় আচ্ছন্ন থাকে, ইহাই তাহার কারণ। সুতরাং এই কারণ বশত সমুদ্র নদ নদী সমুদায়ই তুষারে আবৃত থাকিত, মনুষ্যের বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধা হইত না এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পর নানা প্রকার সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হইয়া এই রূপ সামাজিক উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। করুণাময় ঈশ্বর এই নিমিত্তই বায়ুকে এই সমস্ত অভাব মোচনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে যে তাঁহারই শুভাভিপ্রায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই।

দূরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে, বুধ ও শুক্র গ্রহে নভোমণ্ডল ঊষা ও সন্ধ্যা-রাগে রমণীয় বেশ ধারণ করে এবং মঙ্গল গ্রহে মেঘের উদয় হয়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পরেও আমরা কিয়ৎক্ষণ যে আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা বায়ুর আলোক রক্ষণ ও সংক্রমণ শক্তির ফল ভিন্ন যে আর কিছুই নহে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বুধ ও শুক্র গ্রহে বায়ু না থাকিলে কখনই ঐরূপ কার্য্য সম্ভব হইতে পারে না। জল সূর্য্যের উত্তাপ ও বায়ু দ্বারা বাষ্প রূপে পরিণত হয়, ঐ বাষ্প জল হইতে উৎপন্ন হইবামাত্র নিক-

ঊর্দ্ধ বায়ু অপেক্ষা ক্রমশ লঘু হইতে থাকে। উহা যত লঘু হয়, ততই ঊর্দ্ধে উঠে এবং পরিশেষে এমন এক স্থানে পৌছে, যথায় শীত ও তেজ দ্বারা উহা পুনরায় পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তৎকালে উহার পরমাণু এত সূক্ষ্ম হয় যে, উহা মেঘাকারে উপরে ভাসমান থাকিতে পারে। সুতরাং মঙ্গল গ্রহে যখন মেঘ দৃষ্ট হইয়াছে, তখন উহাতে যে বায়ু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা উল্লেখ করা পুনরুক্তি মাত্র।

যখন ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাষ্প শীত ও তাড়িত আকর্ষণে জল-বিন্দুর আকার প্রাপ্ত হয়, তখন বায়ু আর উহার ভার ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং ঐ সকল জল-বিন্দু বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। যদি শীতাংশ অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম বাষ্প তুষারের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, আবার তাড়িত উত্তাপ দ্বারা উহা শিলা রূপে ভূতলে পতিত হয়।

এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, যে সমস্ত পদার্থ পৃথিবীকে জীব জন্তুর বাসোপযোগী করিয়াছে, যদি ঐ সকল গ্রহে সেই সকল পদার্থের অভাব না থাকে, তাহা হইলে উহাতে জীবের বাস নাই, এ কথা কে স্বীকার করিতে পারে? এমন কি আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, উহাতে যে সমস্ত জীব জন্তু আছে, তাহারা আমাদিগেরই ন্যায় দৈহিক ও সামাজিক উন্নতি অনেকাংশে লাভ করিতেছে। জগদীশ্বর উহাতে উন্নতির যে সমস্ত উপাদান প্রদান করিয়াছেন, তাহা কদাচই ব্যর্থ হইবার নহে।

অমিত্রাশ্চ ন সন্তোষাং যে চামিত্রা ন কস্যচিৎ।
ন এবং মূর্খতে বর্ত্মাঃ সুখং জীবন্তি সর্ব্বদা॥

গণেশ পুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

পূর্ব্ব কালে এই ভারতবর্ষে হিন্দু জাতির মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্ম জন-সমাজ অধিকার করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই বেদ-মূলক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বেদোক্ত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা ইহাকে অতি কঠোর দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। বৌদ্ধেরাও আপনাদিগের ধর্ম্মই সার ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তৎকাল-প্রচলিত বেদোক্ত ধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রদর্শন করিত। এই কারণে বৌদ্ধদিগের সহিত বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঘোরতর বিবাদ হয়। ঐ সময় উভয় পক্ষই আপনাদিগের মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত বহুল গ্রন্থ প্রচার করেন। যাহাতে এই ধর্ম্মের-বৃত্তান্ত প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দর্শন শাস্ত্র। দর্শন শাস্ত্রের পর কতকগুলি পুরাণ প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা সেই সমস্ত পুরাণের মধ্যে গণেশ পুরাণ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মকে অনুস্যূত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত গণেশ পুরাণের উপাখ্যান-ভাগ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

গণেশ পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে। ইহা একখানি উপপুরাণ। এই পুরাণ দুই কাণ্ডে বিভক্ত। ইহার উভয় কাণ্ডেই গণেশের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই পুরাণে গণপতি বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে কোন স্থলে ধ্যান ও কোন স্থলে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাল্পনিক পূজা-পদ্ধতি দ্বারা তাঁহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

এই পুরাণে প্রসঙ্গত গৃৎসমদের উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। গৃৎসমদ বিদর্ভ-

দেশের* রাজা ভীমের পৌত্র। এই রূপ বর্ণিত আছে যে, এই রাজা পুত্রের অভাবে বংশ রক্ষা হইল না দেখিয়া সংসারে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করেন। তথায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহারই আদেশানুসারে দেব-প্রধান গণেশের আরাধনা করেন। অনন্তর এই দেবতার প্রসাদে মহারাজ ভীমের রুক্মাঙ্গ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। একদা ঐ পুত্র মৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক মৃগের অনুসরণ-ক্রমে গন্তব্য পথ বিস্মৃত হইয়া এক মহর্ষির পর্ণশালায় উপনীত হন। ঋষি-পত্নী তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার কোন অসৎ অভিসন্ধি প্রকাশ করেন; কিন্তু রাজকুমার তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তিনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র ভীমতনয় রুক্মাঙ্গের বেশ ধারণ পূর্ব্বক ঐ মহর্ষির পর্ণ-কুটীরে উপস্থিত হন। এই ছদ্মবেশী ইন্দ্র হইতেই গৃৎসমদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অনেকে কহেন যে ভীমতনয় রুক্মাঙ্গই তাঁহার জন্ম-দাতা।

একদা গৃৎসমদ মগধ দেশে কোন যজ্ঞোপলক্ষে গমন করেন। তথায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে জারজ বলিয়া বিলক্ষণ অবমাননা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অপমানিত হইয়া তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কএকটি মুনির সহিত নিরন্তর পরমাত্মস্বরূপ গণেশের ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতেন। এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে গণেশ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাধান্য, ব্রহ্ম-জ্ঞান ও পুষ্পক বন প্রদান করেন।

এক দিন গৃৎসমদ পুষ্পক বনে ধ্যান করিতেছিলেন, ইত্যবসরে যদৃচ্ছাক্রমে নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, একটি বালক তাঁহার নিকট আগমন করিতেছে। পরে সেই বালক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, তপোধন! দেবতা আমাকে আপনার নিকট সমর্পন করিলেন, এক্ষণে আপনি আমার রক্ষক হউন। গৃৎসমদ বালকের এই বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সুতনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করত গণেশোপাসনার নিমিত্ত ধ্যানের শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বালকও গুরু-প্রদিষ্ট ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে গণেশকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিভুবন পরাজয় করিবার বর প্রার্থনা করে। গণেশ তাহার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! শিবের অস্ত্র ব্যতিরেকে আর কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না। আমার বর-প্রভাবে তোমার লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিনটি পুরী হইবে এবং তুমি দেহান্তে পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইবে।

এই বালকটি ত্রিপুরাসুর। এই অসুর বরলাভে উদ্দৃপ্ত হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে পরাভূত করিয়াছিল। দেবতারাও তাহার ভয়ে হিমালয়ের এক গহ্বরে পলায়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ দুর্বৃত্ত অসুর যজ্ঞাদি সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোক অধিকার করিয়াছিল। পরিশেষে কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সম্মতি ক্রমে উহাও অধিকার করে। এই অবসরে মহর্ষি নারদ ঋষি ও দেবগণের নিকট গমন করিয়া কহিয়াছিলেন, এই ত্রিপুরাসুর ধ্যান-বলে গণেশকে প্রসন্ন করিয়া এই রূপ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে, অতএব তোমরা যদি অসুর-নির্দ্দিষ্ট উপা-

* এক্ষণে ইহা বেরার নামে প্রসিদ্ধ।

সনা-প্রণালী অবলম্বন কর, তাহা হইলে গণেশ তোমাদিগের উপরও প্রসন্ন হইবেন। অনন্তর দেবতা ও অন্যান্য ঋষিগণ নারদের এই বাক্যে সম্মত হইয়া ধ্যান-বলে অবিলম্বে গণেশকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। গণেশও তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা দূর করিবার নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়া এক ব্রাহ্মণের বেশে ত্রিপুরেশ্বরের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, অসুর-রাজ! তুমি যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি তোমার নিমিত্ত লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিন পুরী প্রস্তুত করিয়া দিই। পরে তিনি ত্রিপুরেশ্বরের আদেশ ক্রমে ঐ তিন পুরী প্রস্তুত করিলে, অসুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিল। তখন গণেশ কহিয়াছিলেন, কৈলাসে যে চিন্তামণি নামক গণেশের প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাই আমার এই পরিশ্রমের প্রকৃত পুরস্কার। অতএব তুমি আমাকে তাহাই আনয়ন করিয়া দেও। তখন অসুরেশ্বর মহাদেবের নিকট এই বলিয়া এক দূত পাঠাইয়াছিল যে, যদি তুমি স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে চিন্তামণি প্রদান কর, ভালই, নতুবা আমি বল পূর্ব্বক তাহা লইয়া আসিব। মহাদেব এই বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া ঐ অসুরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে তিনি তাহার বল-বিক্রমে পরাভূত হইয়া হিমালয়ের গুহা-মধ্যে পলায়ন করেন। তখন ত্রিপুরাসুর জয়লাভে দর্পিত হইয়া চিন্তামণির মন্দির ভগ্ন করিয়া ঐ দেবতাকে উত্তোলন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া ছিল। এ দিকে নারদ মহাদেবকে অসুরের নিকট পরাভূত ও যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জয় লাভার্থ গণেশের উপাসনা করিতে উপদেশ দেন। মহাদেবও গণেশের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করেন। পরে তিনি পুনরায় দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ অসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ত্রিপুরাসুরও আপনার সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করে। পরিশেষে সে মহাদেবের ভুজ-বলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়।

এই উপাখ্যানে রূপক-ছলে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর নূতন উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কাম্পনিক অনুষ্ঠান সকল উচ্ছিন্ন করিয়াছিল। এই পুরাণের চত্বারিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ত্রিপুরাসুর সমুদায় দেবগণ ও ঋষিদিগকে পরাজয় করত যজ্ঞকুণ্ড, পুণ্য-ক্ষেত্র, দেবালয়, ধার্ম্মিকদিগের আশ্রয়-স্থান ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন করে। তাহার ভয়ে স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়া যায় এবং বেদের আলোচনা রহিত হয়। আমরা যখন মহাবংশে অশোক রাজার জীবন-চরিত পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই যে, তিনি যখন বেদোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহা হইতে এই রূপ কতক গুলি অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে রূপে পৌত্তলিকদিগের ক্রিয়া কলাপ উচ্ছিন্ন করে, অসুর-কৃত এই কার্য্যের সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ইহা দ্বারা এই রূপ প্রতিপাদিত হইতেছে যে, গৃৎসমদ কালসহকারে বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং বেদের মধ্যে স্বহস্তে যে সমস্ত দেবতার স্তুতিবাদ রচনা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আর তাঁহার কিছু মাত্র ভক্তি ছিল না। কারণ ত্রিপুরাসুর তাঁহারই শিষ্য। ত্রিপুরা-

সুর দেবতাদিগের প্রতি যে রূপ অত্যাচার করে, তাহা তাঁহারই শিক্ষিত, সন্দেহ নাই।

দেবতা দিগের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ ও তাঁহাদিগের স্তুতি গান বেদোক্ত ধর্ম্মে উপাসনার উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া প্রথিত আছে। কিন্তু গৃৎসমদ ও ত্রিপুরাসুর ধ্যানই প্রকৃত উপাসনা বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। যখন গৃৎসমদ মগধ দেশে মুনিগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক নিভৃত স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি ধ্যান দ্বারাই গণেশকে প্রসন্ন করেন এবং ত্রিপুরাসুরও তাঁহার শিষ্য হইয়া উপাসনার ঐ রূপ প্রণালী অবলম্বন করে। বৈদিক উপাসনা প্রার্থনা-প্রধান ছিল। বেদ অনুসন্ধান করিলে তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে ধ্যানের প্রথা কিছুমাত্র প্রচলিত ছিল না। বৌদ্ধেরাই উহা প্রচলিত করিয়া যায়। গৃৎসমদ ও ত্রিপুরাসুরের এই উপাসনা প্রণালী দেবতারা কিছুই জানিতেন না, নারদ গিয়া তাঁহাদিগকে ইহার বিষয় অবগত করেন, এবং ইহা তাঁহাদিগের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের বিষয় সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণকে মুক্তি বলিয়া থাকে। বৈদান্তিক মুক্তি ও নির্বাণ প্রায় একই প্রকার। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে এই রূপ মুক্তির ভাব লোকের মনে উদিত হয় নাই। লোকান্তরে বৈষয়িক সুখই সাধারণের প্রার্থনীয় ছিল। কেহ সূর্য্যলোকে কেহ বা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিবে, দেবগণের নিকট এই রূপই প্রার্থনা করিত। কিন্তু ত্রিপুরেশ্বর মহাদেবের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া লীন হইয়া গেল, এই বাক্য দ্বারা বৌদ্ধমতে মুক্তির যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

গৃৎসমদের স্ত্রীপুত্রাদি কিছুই ছিল না। তিনি ঐ বালকটিকে দত্তক পুত্র রূপে প্রতিগ্রহ করিয়া ছিলেন। ইহাও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিগের একটি চিহ্ন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বিবাহাদি কিছুই করেন না এবং একটি দত্তক পুত্র প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, গ্রন্থকার কৌশলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত এবং উন্নতি ও অবনতি স্বপ্রণীত গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং বেদের সূক্তকার গৃৎসমদ যে বৈদিক ধর্ম্মের বন্ধনমুক্ত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাও বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ২২ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ৭॥০ টার সময় এবং অপরাহ্ন ৭॥০ টার সময় বহরমপুরে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৬ ফাল্গুন রবিবার সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৬৭। ১ মাঘ শুক্র বার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে প্রথমং সূক্তং।
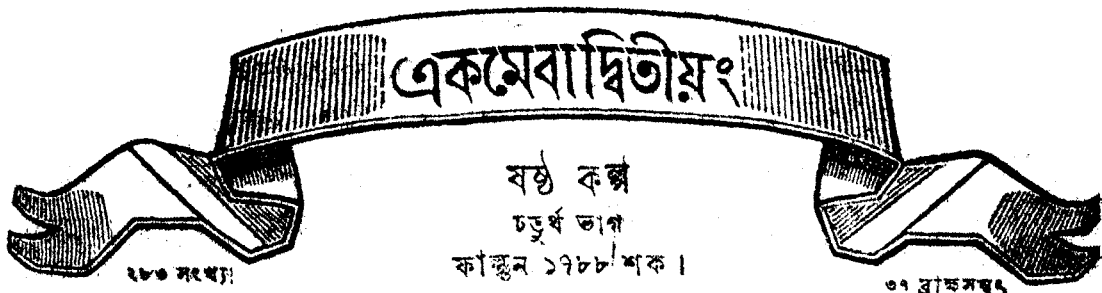
গোতমঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ মরুতোদেবতা।

১০০১

৭। তেঽবর্ধন্ত স্বতবসো মহিত্বনা নাকং তস্থুরুরু চক্রিরে সদঃ। বিষ্ণুর্যদ্ধাবদ্বৃষণং মদচ্যুতং বয়ো ন সীদন্নধি বর্হিষি প্রিয়ে।

৭। 'তে' মরুতঃ 'অবর্ধন্ত' বৃদ্ধিং গতাঃ। কীদৃশাঃ 'স্বতবসঃ' স্বাশ্রয়বলাঃ নান্যস্য কস্যচিদ্বলমপেক্ষন্তে। বৃদ্ধিং প্রাপ্য চ 'মহিত্বনা' মহিম্না মহত্বেন 'নাকং' স্বর্গং 'আ তস্থুঃ' আস্থিতবন্তঃ। 'সদঃ' সদনং স্বস্থানং দ্যাবাপৃথিবীলক্ষণং স্বকীয়নিবাসায় 'উরু' বিস্তীর্ণং 'চক্রিরে' যৎ যেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ যন্দর্থং 'বৃষণং' কামাভিবর্ষকং 'মদচ্যুতং' মদস্য হর্ষস্যাসেক্তারং যজ্ঞং 'বিষ্ণুঃ আবৎ' বিষ্ণুরেবাগত্য রক্ষতি। তে মরুতঃ 'বয়ঃ ন' পক্ষিণো যথা শীঘ্রমাগচ্ছন্তি এবং শীঘ্রমাগত্য 'বর্হিষি অধি' অস্মদীয়ে যজ্ঞে 'প্রিয়ে' প্রীতিকরে 'সীদন্' সীদন্তু উপবিশন্তু তে অবর্ধন্ত।

৭। বিষ্ণু যাঁহাদিগের নিমিত্ত কামপ্রদ হর্ষজনক যজ্ঞকে রক্ষা করেন, যাঁহারা অন্যের বল অপেক্ষা করেন না, সেই মরুদ্গণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মহিমা প্রভাবে স্বর্গে অবস্থান ও আকাসরূপ বাসস্থানকে বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র আসিয়া এই প্রীতিকর যজ্ঞে উপবেশন করুন।

১০০২

৮। শূরা ইবেদ্যুযুধয়ো ন জগ্ময়ঃ শ্রবস্যবো ন পৃতনাসু যেতিরে। ভয়ন্তে বিশ্বা ভুবনা মরুদ্ভ্যো রাজান ইব ত্বেষসন্দৃশো নরঃ।

৮। 'ইৎ' ইত্যেতৎ সমুচ্চয়ে। 'শূরাঃ ইব ইৎ' শৌর্য্যোপেতাঃ যুযুৎসবঃ পুরুষা ইব চ 'যুযুধয়ঃ' 'ন' শত্রুভির্যুধ্যমানাঃ পুরুষাইব চ 'জগ্ময়ঃ' শীঘ্রং গচ্ছন্তো মরুতঃ 'শ্রবস্যবঃ ন' শ্রবমন্নমাত্মন ইচ্ছন্তঃ পুরুষাইব 'পৃতনাসু' সংগ্রামেষু 'যেতিরে' প্রযতন্তে বৃত্রাদিভির্যুদ্ধে ব্যাপ্রিয়ন্তে। তাদৃশেভ্যঃ 'মরুদ্ভ্যঃ' 'বিশ্বা ভুবনা' সর্ব্বাণি ভূতজাতানি 'ভয়ন্তে' বিভ্যতি। যে 'নরঃ' বৃষ্ট্যাদের্নেতারঃ মরুতঃ 'রাজান ইব' রাজমানা নৃপতয় ইব 'ত্বেষসন্দৃশঃ' দীপ্তসন্দর্শনাঃ উগ্ররূপতয়া দ্রষ্টুমশক্যা ভবন্তি তেভ্য ইত্যর্থঃ।

৮। শৌর্য্যশালী, যুদ্ধোদ্যত পুরুষের ন্যায় শীঘ্রগামী মরুৎগণ অন্নার্থী পুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন, বৃষ্টি প্রভৃতি আনয়ন করেন, রাজাদিগের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হন এবং সমস্ত ভুবন তাঁহাদিগকে ভয় করে।

১০০৩

৯। ত্বষ্টা যদ্বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ। ধত্ত ইন্দ্রো নর্যপাংসি কর্তবেহহন্বৃত্রং নিরপামৌজ্জদর্ণবং।

৯। ‘স্বপাঃ’ শোভনকর্মা ‘ত্বষ্টা’ বিশ্বনির্মাতা ‘যদ্বজ্রং’ ‘অবর্তয়ৎ’ ইন্দ্রং প্রত্যগময়ৎ দত্তবানিত্যর্থঃ কীদৃশং ‘সুকৃতং’ সম্যক্ নিষ্পাদিতং ‘হিরণ্যয়ং’ সুবর্ণময়ং ‘সহস্রভৃষ্টিং’ অনেকাভির্ধারাভির্যুক্তং তদ্বজ্রং ‘ইন্দ্রঃ’ ‘ধত্তে’ ধারয়তি কিমর্থং ‘নরি’ অত্র নৃসম্বন্ধাৎ নৃশব্দেন সংগ্রামোঽভিধীয়তে। সংগ্রামে ‘অপাংসি’ শত্রুহননাদি লক্ষণানি কর্ম্মাণি ‘কর্তবে’ কর্তুং এবং বজ্রং ধৃত্বা তেন বজ্রেণ ‘বৃত্রং’ বৃষ্ট্যুদকস্যাবরকং ‘অর্ণবং’ অর্ণসা উদকেন যুক্তং মেঘম্ ‘অহন্’ অবধীৎ অপাং তেন নিরুদ্ধা অপশ্চ সঃ ‘নিরৌজ্জৎ’ নিঃশেষেণাধোমুখমপাতয়ৎ প্রবৃষ্টা অকরোদিত্যর্থঃ।

৯। কর্ম্মকুশল বিশ্বকর্ম্মা যে সুচাত সুবর্ণময় সহস্র-ধার বজ্র ইন্দ্রকে দেন, ইন্দ্র তাহা সংগ্রামে শত্রু নাশের নিমিত্ত ধারণ করেন। তিনি তদ্দ্বারা বৃত্রকে নিহত ও জলপূর্ণ মেঘ সকলকে নিঃশেষে অধঃ পতিত করেন।

১০০৪

১০। ঊর্দ্ধং নুনুদ্রেঽবতং ত ওজসা দাদৃহাণং চিদ্বিভিদুর্বি পর্বতং। ধমন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবো মদে সোমস্য রণ্যানি চক্রিরে।

১০। অত্রেয়মাখ্যায়িকা। গোতম ঋষিঃ পিপাসয়া পীড়িতঃ সন্ মরুত উদকং যযাচে। তদনন্তরং মরুতোঽদূরস্থং কূপ মুদ্ধৃত্য যত্র স গোতম ঋষি স্তিষ্ঠতি তাং দিশং নীত্বা ঋষিসমীপে কূপমবস্থাপ্য তৎপার্শ্বে আহাবং চ কৃত্বা তস্মিন্নাহাবে কূপ মুৎসিচ্য তমৃষিং তেনোদকেন তর্পয়াঞ্চক্রুঃ। অয়মর্থ অনয়োত্তরয়াচ প্রতিপাদ্যতে। ‘তে’ মরুতঃ ‘অবতং’ অবস্তাৎ ততোভবতীত্যবতঃ কূপঃ। কূপনামসুচাবতোঽবট ইতি পঠিতং। তং ‘ঊর্দ্ধং’ উপরি যথা ভবতি তথা ‘ওজসা’ স্বকীয়েন বলেন ‘নুনুদ্রে’ প্রেরিতবন্তঃ উৎখাতবন্ত ইত্যর্থঃ। এবং কূপমুৎখায় ঋষেরাশ্রমং প্রতি নয়ন্তোমরুতো মার্গ মধ্যে ‘দাদৃহাণং’ প্রবৃদ্ধং গতিনিরোধকং ‘পর্বতঞ্চিৎ’ পর্ব্ববন্তং শিলোচ্চয়মপি ‘বিবিভিদুঃ’ বিশেষেণ বভঞ্জুঃ। ‘সুদানবঃ’ শোভনদানা স্তে মরুতঃ ‘বাণং’ শতসংখ্যাভিস্তন্ত্রীভির্যুক্তং বীণাবিশেষং ‘ধমন্তঃ’ বাদয়ন্তঃ ‘সোমস্য মদে’ সোমপানেন হর্ষে সতি ‘রণ্যানি’ স্তুত্যানি রমণীয়ানি ধনানি ‘চক্রিরে’ স্তোতৃভ্যঃ কুর্ব্বন্তি।

১০। দান শীল মরুদ্গণ স্বীয় তেজে কূপকে ঊর্দ্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন, গতিরোধক পর্ব্বতকে নিঃশেষে ভেদ করিয়াছেন এবং সোমপানে হৃষ্ট হইয়া শততন্ত্রী বীণা বাদ্য করিতে করিতে স্তোতৃগণকে রমণীয় ধন দান করেন।

১০০৫

১১। জিহ্মং নুনুদ্রেঽবতং তয়া দিশাসিঞ্চন্নুৎসং গোতমায় তৃষ্ণজে। আ গচ্ছন্তীমবসা চিত্রভানবঃ কামং বিপ্রস্য তর্পয়ন্ত ধামভিঃ।

১১। মরুতঃ ‘অবতং’ উদ্ধৃতং কূপং যস্যাং দিশি ঋষির্বসতি ‘তয়া দিশা’ ‘জিহ্মং’ বক্রং তির্যঞ্চং ‘নুনুদ্রে’ প্রেরিতবন্তঃ। এবং কূপং নীত্বা ঋষ্যাশ্রমে অবস্থাপ্য ‘তৃষ্ণজে’ তৃষিতায় গোতমায় ঋষয়ে তদর্থং ‘উৎসং’ জলপ্রবাহং কূপাৎ উদ্ধৃত্য ‘অসিঞ্চন্’ আহাবে অবানয়ন্। এবং কৃত্বা ‘ইমং’ এনং স্তোতারং ঋষিং ‘চিত্রভানবঃ’ বিচিত্র দীপ্তয়ঃ তে মরুতঃ ‘অবসা’ ঈদৃশেন রক্ষণেন সহ আগচ্ছন্তি তৎসমীপং প্রাপ্নুবন্তি। প্রাপ্য চ ‘বিপ্রস্য’ মেধাবিনঃ গোতমস্য ‘কামং’ অভিলাষং ‘ধামভিঃ’ আয়ুষোধারকৈঃ উদকৈঃ ‘তর্পয়ন্ত’ অতর্পয়ন্।

১১। মহর্ষি গোতম তৃষিত হইয়া যে দিকে অবস্থান করিতে ছিলেন, মরুদ্গণ সেই উৎখাত কূপকে সেই দিক্ দিয়া বক্র ভাবে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার নিমিত্ত জলপ্রবাহ সেচন করিলেন। বিচিত্রদীপ্তি মরুদ্গণ এই রূপে সেই বিপ্রের নিকট আগমন করিয়া প্রাণদ জল দ্বারা তাঁহার পিপাসা শান্তি করিয়াছিলেন।

১০০৬

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

১২। যাবঃ শর্ম্ম শশমানায় সন্তি ত্রিধাতূনি দাশুষে যচ্ছ–

তাৰ্ধি। অস্মভ্যং তানি মরুতো বি যন্ত রয়িং নো ধত্ত বৃষণঃ সুবীরং। ১। ৬। ১০।

১২। হে 'মরুতঃ' 'বঃ' যুষ্মাকং সম্বন্ধীনি 'যা' যানি 'শর্ম্ম' শর্ম্মাণি সুখানি গৃহাণি বা কীদৃশানি 'ত্রিধাতূনি' পৃথিব্যাদিষু ত্রিষু স্থানেষু অবস্থিতানি 'শশমানায়' যুষ্মান্ স্তুতিভিঃ স্তজমানায় দাতুং সম্পাদিতানি পূর্ব্বোক্তলক্ষণানি শর্ম্মাণি যানি সন্তি যানি চ 'দাশুষে' হবির্দত্তবতে যজমানায় 'অধিযচ্ছত অধিকং প্রযচ্ছথ হে মরুতঃ 'তানি' সর্ব্বাণি শর্ম্মাণি 'অস্মভ্যং' 'বিযন্ত' বিশেষেণ প্রযচ্ছত। কিঞ্চ হে 'বৃষণঃ' কামানাং বর্ষিতারঃ মরুতঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'সুবীরং' শোভনৈর্বীরৈঃ পুত্রাদিভির্যুক্তং রয়িং ধনং 'ধত্ত' দত্ত। ১। ৬.১০।

১২। হে মরুৎগণ! ভুবন ত্রয়ে তোমাদিগের যে সকল সুখ ভক্তজনের নিমিত্ত সঞ্চিত আছে, যাহা যজমানকে অধিক রূপে দান করিয়া থাক, তাহা আমাদিগকে বিশেষরূপে দান কর এবং হে কামপ্রদ মরুদ্গণ! আমাদিগকে বীর পুত্র প্রভৃতি ধনসম্পত্তি বিতরণ কর। ১। ৬। ১০।

সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৮৮ শক ১১ মাঘ।

প্রাতঃকাল।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বেদিতে উপবেশন করিয়া স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বেচরাম চট্টোপাধ্যায় ভক্তি পূর্ব্বক একটি সুললিত প্রার্থনা করিলে সঙ্গীতান্তে সভাভঙ্গ হইল।

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বেদিতে উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—

প্রতি বর্ষেই এগারই মাঘ উপস্থিত হয়, প্রতি বর্ষেই এই মধুময় মহোৎসব আমারদিগকে আকর্ষণ করে এবং প্রতি বর্ষেই আমরা একত্র সমাগত হইয়া ইহার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। এই এগারই মাঘ সাধারণের নিকট সম ভাবেই উদয় হইয়া থাকে; কিন্তু কেবল ব্রাহ্মেরাই এই সময়ে অপার আনন্দ লাভ করেন—কিসের জন্য? আমারদিগের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের ও ব্রাহ্মসমাজের সহিত এগারই মাঘের যে মধুময় সম্বন্ধ আছে, তাহারই গুণে এগারই মাঘ আমাদের নিকট মধুর ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এগারই মাঘ শূন্য পদার্থ, কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে যে মাধুর্য্যরসে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তাহা এই এগারই মাঘেও বিলক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছে।

তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে প্রথম সূর্য্যোদয়ের ন্যায় এই অন্ধকারিত দেশে যে দিন এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই দিন—সেই প্রথম এগারই মাঘ কি শুভ ক্ষণে প্রভাত হইয়াছিল? কে জানিত যে সেই দিনই আমাদের চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে? কিন্তু বস্তুত সে দিন আর নাই, সাঁইত্রিশ বৎসর হইল, সে দিন অতীত হইয়া গিয়াছে—আজি আমরা অষ্টত্রিংশ এগারই মাঘে উপস্থিত হইয়া নবতর কল্যাণতর আনন্দরসে আপূরিত হইতেছি। আবার খানিক পরে এ দিনও অবসন্ন হইবে। এই আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। এই নব পল্লব ও পুষ্পমালা শুষ্ক হইয়া পড়িবে। যাঁহারা উৎসবার্থী বা দর্শনার্থী হইয়া এই উৎসবভূমি অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোথায় চলিয়া যাইবেন।

কিন্তু ভয় হয়, আজি সেই আনন্দময়ের আনন্দ যে পরিমাণে লাভ করিতে পারি-

রাছি, মহোৎসবের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতেও কি বঞ্চিত হইতে হইবে! আজি তাঁহার প্রেম জ্যোতি হৃদয়মুকুরে যে প্রকার প্রতিফলিত হইয়াছে, এই আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও কি নির্ব্বাণ হইতে থাকিবে! আজি যেই অতীন্দ্রিয় স্নিগ্ধ মূর্ত্তি যে প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও কি আবার তিরোহিত হইবে! আজি আশা কামনা, শ্রদ্ধা ভক্তি, অনুরাগ প্রীতি যে প্রকার চরিতার্থ হইতেছে, তাহা কি আর হইবে না!

হা! চিত্তের চঞ্চলতা স্মরণ হইলে সমুদায় শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আজি যার জন্য অনুতাপের অগ্নি জ্বালিয়া হৃদয় দগ্ধ হইতে যায়, কালি আবার প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। যেএক বার সন্ন্যাসী হইয়া—সর্ব্বত্যাগী হইয়া প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে, সেই আবার চির-জীবন-সম্বল ধর্ম্ম-রত্ন সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাপময় হ্রদে অবগাহন করিয়া থাকে। আমারদের অদূরদর্শী মোহময় আত্মা পৃথিবীর মলিন পদার্থেই আসক্ত হইতে চায়, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে না, পরিণাম ভাবিয়া দেখে না, অমৃত বোধে বিষ পান করে।

এই দুরবস্থ আত্মাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সময়ে সময়ে এই মহোৎসবকে আনয়ন করিয়া তাহাতে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতেছেন। এই উৎসব কেবল উৎসবের জন্যে নয়, বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ হৃদয়ের উদ্বোধনের নিমিত্ত। হে মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর! অদ্যকার ভাব যেন চিরস্থায়ী হয়, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এই রূপে উদ্বোধন করিলেন।

যিনি অখিল বিধাতা, বিশ্বমাতা; তিনিই আমারদিগের মুক্তিদাতা, উপাস্য দেবতা। যাঁহা হইতে চন্দ্র সূর্য্য, গিরি নদী সাগর, সকলই নিঃসৃত হইয়াছে, আমরা সকলে তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া তাঁহার দ্বারাই জীবিত রহিয়াছি। ভূলোক দ্যুলোক যাঁহার যশঃ প্রচার করিতেছে, এই দীপালোক যাঁহার প্রেমালোক বিকীর্ণ করিতেছে, এই বিচিত্র পুষ্পমালা সকল এখানে যাঁর অমৃত সৌরভ—যাঁর হস্তের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে; আমরা এই পবিত্র উৎসব সমাজে আজ শুভ ১১ মাঘে সেই দেব-দেবেরই পূজা করিতে সকলে একহৃদয় হইয়া একত্রিত হইয়াছি।

কিছুই ছিল না, যিনি এই সকলই সৃষ্টি করিলেন, যিনি জড় শরীরের সঙ্গে অশরীরী বিজ্ঞানময় আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া দিয়া আপনার জ্ঞান বিজ্ঞানের, শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন; যিনি শরীরের জন্য অন্নপান, আত্মার জন্য জ্ঞান ধর্ম্ম বিধান করিয়া আপনার অতুল দয়ার পরিচয় প্রদান করিলেন, যিনি জগতের-জ্যোতি ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষে—এই বঙ্গদেশের নিবিড় মোহান্ধকার তিরোহিত করিলেন, পৃথিবীর উন্নতি সাধন করিলেন; আজি সেই "একদেব ত্রিভুবনপরিপালক" পরমেশ্বরের সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা উপহার লইয়া সকলে আগমন করিয়াছি। বিজ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত করিয়া সেই বিজ্ঞান-ঘন জ্যোতির জ্যোতিকে এখানে সকলে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন কর। সেই ত্রিভুবনরাজকে অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান অবলোকন করিয়া সকলে উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁর পবিত্র চরণে প্রীতিপুষ্প অর্পণ কর। ভক্তিভরে তাঁর পদে প্রণিপাত করিয়া সকলে তাঁর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হও। যোড়করে তাঁর যশোগানে রসনাকে নিয়োগ কর।

অনন্তর স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্লোক তাৎপর্য্যের সহিত পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন—

অদ্য কি শুভ দিন। অদ্য প্রীতি-রূপ শশধরের সুশীতল কিরণে বিশ্ব সংসার উদ্ভাসিত হইতেছে। অদ্যকার এই সুখ-ময় সময় আমারদিগের পক্ষে পরম পবিত্র ও প্রার্থনীয়। যিনি অদ্য সমাজস্থ হইয়া কেবল এই আলোক-মালা-মণ্ডিত সভার বাহ্য শোভা দেখিতেছেন, তিনি এই স্থা-নের অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব শোভার কিছুই আস্বাদ পাইতেছেন না। অদ্য এই সভার বাহ্য শোভা অপেক্ষা অনন্ত-গুণ শোভাকর রমণীয় জ্যোতি তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে না। অদ্য আমরা এক বৎসর পরে সাম্বৎসরিক কার্য্য সম্পাদনার্থ ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই এক বৎ-সরের মধ্যে সূর্য্য অনুক্রমে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়াছেন; সমুদায় ঋতু পর্য্যায় ক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে; পৃথি-বীও গিরি নদী নির্ঝর অরণ্য গ্রাম নগর প্রভৃতি সমুদায় বক্ষে বহন করিয়া সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! এই সময়ের মধ্যে তোমরা কত দূর উন্নতি করিলে অদ্য এই স্থানে এক বার তাহা চিন্তা কর। এই উন্নতি ধনের নয়, মানের নয়, যশের নয়, প্রভুত্বেরও নয়; ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতি। যদি এই উন্নতি লাভে যত্ন করিয়া থাক, তবে গত বৎসর তোমার-দিগের যথার্থই উন্নতি লাভ হইয়াছে, গত বৎসরের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সৎব্যবহারেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অদ্য সপ্তত্রিংশ বৎসর আমারদিগের এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম হইল। এই অল্প কালের মধ্যে ইহার যে রূপ অসম্ভা-বিত উন্নতি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে এক্ষণে উৎসাহের সহিত মুক্ত কণ্ঠে এই রূপ বলা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি ও সমস্ত ব্যক্তিরই ইহা আশ্রয়ণীয় হইবে। ইহা যে সাধারণ ধর্ম্ম, অচির কাল মধ্যে এই বাক্য সার্থক হইবে। পৃথিবীতে সমুদ্র যেমন এক, সেই রূপ ধর্ম্মও এক; আমাদিগের এই সনাতন ধর্ম্ম অনতিবিলম্বে সেই একের স্থান অধিকার করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই রূপ উন্নত অধিকার ঈশ্বর স্বয়ংই প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! এক্ষণে তোমরা এক বার আলোচনা করিয়া দেখ, আমারদি-গের এই পবিত্র ধর্ম্ম ক্রমশ আপনার পথ কেমন পরিস্কার করিয়া লইতেছে; পৌ-ত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া কেমন অগ্রসর হইতেছে; সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া লোকের প্রীতিদৃষ্টি কেমন আকর্ষণ করিতেছে; আমরা যখনই ইহা চিন্তা করি, তখনই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই; আমারদিগের আশা বলবতী হয় এবং মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই পবিত্র স্বর্গীয় ধর্ম্মকে ভূতলে উপনীত করিয়া যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা নিতান্ত সুকঠিন। আমরা এই উন্নত ধর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী রহি-য়াছি। তিনি যদি এই বঙ্গ দেশে ইহার প্রতিষ্ঠাপনে যত্ন না করিতেন; তাহা হইলে আমারদিগের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিত না। কত মনুষ্য কুসংস্কার পাশে জড়িত ও অজ্ঞানান্ধ-কূপে নিপতিত হইয়া মনুষ্য-নামের গৌরব পরিহার করিত—কত মনুষ্য বিদ্যার সুনির্ম্মল আলোকে উদ্ভাসিত হই-

আছি, মহোৎসবের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাতেও কি বঞ্চিত হইতে হইবে। আজি তাঁহার প্রেম জ্যোতি হৃদয়মুকুরে যে প্রকার প্রতিফলিত হইয়াছে, এই আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও কি নির্ব্বাণ হইতে থাকিবে! আজি যেই অতীন্দ্রিয় স্নিগ্ধ মূর্ত্তি যে প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও কি আবার তিরোহিত হইবে! আজি আশা কামনা, শ্রদ্ধা ভক্তি, অনুরাগ প্রীতি যে প্রকার চরিতার্থ হইতেছে, তাহা কি আর হইবে না!

হা! চিত্তের চঞ্চলতা স্মরণ হইলে সমুদায় শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। আজি যার জন্য অনুতাপের অগ্নি জ্বালিয়া হৃদয় দগ্ধ হইতে যায়, কালি আবার প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। যেএক বার সন্ন্যাসী হইয়া—সর্ব্বত্যাগী হইয়া প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করে, সেই আবার চির-জীবন-সম্বল ধর্ম্ম-রত্ন সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাপময় হ্রদে অবগাহন করিয়া থাকে। আমারদের অদূরদর্শী মোহময় আত্মা পৃথিবীর মলিন পদার্থেই আসক্ত হইতে চায়, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে না, পরিণাম ভাবিয়া দেখে না, অমৃত বোধে বিষ পান করে।

এই দুরবস্থ আত্মাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সময়ে সময়ে এই মহোৎসবকে আনয়ন করিয়া তাহাতে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতেছেন। এই উৎসব কেবল উৎসবের জন্যে নয়, বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ হৃদয়ের উদ্বোধনের নিমিত্ত। হে মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর! অদ্যকার ভাব যেন চিরস্থায়ী হয়, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এই রূপে উদ্বোধন করিলেন।

যিনি অখিল বিধাতা, বিশ্বমাতা; তিনিই আমারদিগের মুক্তিদাতা, উপাস্য দেবতা। যাঁহা হইতে চন্দ্র সূর্য্য, গিরি নদী সাগর, সকলই নিঃসৃত হইয়াছে, আমরা সকলে তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া তাঁহার দ্বারাই জীবিত রহিয়াছি। ভূলোক দ্যুলোক যাঁহার যশঃ প্রচার করিতেছে, এই দীপালোক যাঁহার প্রেমালোক বিকীর্ণ করিতেছে, এই বিচিত্র পুষ্পমালা সকল এখানে যাঁর অমৃত সৌরভ—যাঁর হস্তের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে; আমরা এই পবিত্র উৎসব সমাজে আজ শুভ ১১ মাঘে সেই দেব-দেবেরই পূজা করিতে সকলে এক হৃদয় হইয়া একত্রিত হইয়াছি।

কিছুই ছিল না, যিনি এই সকলই সৃষ্টি করিলেন, যিনি জড় শরীরের সঙ্গে অশরীরী বিজ্ঞানময় আত্মাকে আবদ্ধ করিয়া দিয়া আপনার জ্ঞান বিজ্ঞানের, শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন; যিনি শরীরের জন্য অন্নপান, আত্মার জন্য জ্ঞান ধর্ম্ম বিধান করিয়া আপনার অতুল দয়ার পরিচয় প্রদান করিলেন, যিনি জগতের-জ্যোতি ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষে—এই বঙ্গদেশের নিবিড় মোহান্ধকার তিরোহিত করিলেন, পৃথিবীর উন্নতি সাধন করিলেন; আজি সেই "একদেব ত্রিভুবন-পরিপালক" পরমেশ্বরের সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা উপহার লইয়া সকলে আগমন করিয়াছি। বিজ্ঞান-নয়ন উন্মীলিত করিয়া সেই বিজ্ঞান-ঘন জ্যোতির জ্যোতিকে এখানে সকলে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন কর। সেই ত্রিভুবনরাজকে অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান অবলোকন করিয়া সকলে উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁর পবিত্র চরণে প্রীতিপুষ্প অর্পণ কর। ভক্তিভরে তাঁর পদে প্রণিপাত করিয়া সকলে তাঁর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হও। যোড়করে তাঁর যশোগানে রসনাকে নিয়োগ কর।

অনন্তর স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্লোক তাৎপর্য্যের সহিত পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন—

অদ্য কি শুভ দিন। অদ্য প্রীতি-রূপ শশধরের সুশীতল কিরণে বিশ্ব সংসার উদ্ভাসিত হইতেছে। অদ্যকার এই সুখময় সময় আমারদিগের পক্ষে পরম পবিত্র ও প্রার্থনীয়। যিনি অদ্য সমাজস্থ হইয়া কেবল এই আলোক-মালা-মণ্ডিত সভার বাহ্য শোভা দেখিতেছেন, তিনি এই স্থানের অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব শোভার কিছুই আস্বাদ পাইতেছেন না। অদ্য এই সভার বাহ্য শোভা অপেক্ষা অনন্ত-গুণ শোভাকর রমণীয় জ্যোতি তাঁহার কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ হইতেছে না। অদ্য আমরা এক বৎসর পরে সাম্বৎসরিক কার্য্য সম্পাদনার্থ ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। এই এক বৎসরের মধ্যে সূর্য্য অনুক্রমে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়াছেন; সমুদায় ঋতু পর্য্যায় ক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে; পৃথিবীও গিরি নদী নির্ঝর অরণ্য গ্রাম নগর প্রভৃতি সমুদায় বক্ষে বহন করিয়া সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করিয়াছে। ব্রাহ্মগণ! এই সময়ের মধ্যে তোমরা কত দূর উন্নতি করিলে অদ্য এই স্থানে এক বার তাহা চিন্তা কর। এই উন্নতি ধনের নয়, মানের নয়, যশের নয়, প্রভুত্বেরও নয়; ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতি। যদি এই উন্নতি লাভে যত্ন করিয়া থাক, তবে গত বৎসর তোমারদিগের যথার্থই উন্নতি লাভ হইয়াছে, গত বৎসরের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সৎব্যবহারেই পর্য্যবসিত হইয়াছে।

অদ্য সপ্তত্রিংশ বৎসর আমারদিগের এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম হইল। এই অল্প কালের মধ্যে ইহার যে রূপ অসম্ভাবিত উন্নতি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে এক্ষণে উৎসাহের সহিত মুক্ত কণ্ঠে এই রূপ বলা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি ও সমস্ত ব্যক্তিরই ইহা আশ্রয়ণীয় হইবে। ইহা যে সাধারণ ধর্ম্ম, অচির কাল মধ্যে এই বাক্য সার্থক হইবে। পৃথিবীতে সমুদ্র যেমন এক, সেই রূপ ধর্ম্মও এক; আমাদিগের এই সনাতন ধর্ম্ম অনতিবিলম্বে সেই একের স্থান অধিকার করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই রূপ উন্নত অধিকার ঈশ্বর স্বয়ংই প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! এক্ষণে তোমরা এক বার আলোচনা করিয়া দেখ, আমারদিগের এই পবিত্র ধর্ম্ম ক্রমশ আপনার পথ কেমন পরিস্কার করিয়া লইতেছে; পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া কেমন অগ্রসর হইতেছে; সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া লোকের প্রীতিদৃষ্টি কেমন আকর্ষণ করিতেছে; আমরা যখনই ইহা চিন্তা করি, তখনই বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই; আমারদিগের আশা বলবতী হয় এবং মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই পবিত্র স্বর্গীয় ধর্ম্মকে ভূতলে উপনীত করিয়া যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করা নিতান্ত সুকঠিন। আমরা এই উন্নত ধর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ ঋণী রহিয়াছি। তিনি যদি এই বঙ্গ দেশে ইহার প্রতিষ্ঠাপনে যত্ন না করিতেন; তাহা হইলে আমারদিগের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিত না। কত মনুষ্য কুসংস্কার পাশে জড়িত ও অজ্ঞানান্ধ-কূপে নিপতিত হইয়া মনুষ্যনামের গৌরব পরিহার করিত—কত মনুষ্য বিদ্যার সুনির্ম্মল আলোকে উদ্ভাসিত হই-

প্রাপ্ত তৃপ্তিকর ধর্ম্মের অসদ্ভাবে হীন-ভাব ধারণ করিত—কত মনুষ্য অনৈসর্গিক ধর্ম্মে প্রকৃত প্রীতি লাভ করিতে না পারিয়া অধার্ম্মিকতা ও নাস্তিকতা অবলম্বন করিত—কত মনুষ্য পাপ-পঙ্কে কলুষিত বিষয়োপ-ভোগ-নিরত ও পারত্রিক-শুভ-প্রত্যাশা-বিরহিত হইয়া আরণ্য পশুর ন্যায় অনেকের অসুখের কারণ হইত। কিন্তু ধন্য সেই মহাত্মাকে, যিনি বিদ্যার উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতির মুখে এই পবিত্র নিত্য ধর্ম্ম নিক্ষিপ্ত করিয়া জীবলোককে মহা বিনাশ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন; যিনি এই দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ অন্ধকারময় পথে আলোক প্রদান পূর্ব্বক সুখ-সঞ্চারের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সেই মহাত্মার ধৈর্য্য, সাহস ও কার্য্য-দক্ষতা অতি অদ্ভুত। তিনি এই বঙ্গভূমির তাদৃশ গাঢ়তর তমোময় অবস্থায় নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি সহ্য করিয়াও এই পবিত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই ধর্ম্ম শৈশবাবস্থাতেই যে রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেই ইহার ভাবী উন্নতির এক প্রকার আশাচ্ছেদ হয়; কিন্তু এক মাত্র রাজা রামমোহন রায়ের কায়িক, বাচিক ও মানসিক সাহায্যে ইহাকে কেহ তৎকালে উন্মূলিত করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পূর্ব্বে যাঁহারা এই ধর্ম্মের জীবনে আঘাত করিবার নিমিত্ত গাঢ়তর যত্ন ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারদিগের সন্তানেরাই ইহার জীবন প্রদান করিবার নিমিত্ত যথোচিত পরিশ্রম করিতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম শ্রবণ করিলে কর্ণে হস্তার্পণ করিতেন, এক্ষণে তাঁহারদিগের সন্তানেরাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নাম শ্রবণ করিয়া কর্ণে যেন অমৃত ধারা বর্ষণ হইল, এই রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত সামাজিক কোন কার্য্যে সংস্রব হইলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতেন, এক্ষণে তাঁহারদিগেরই সন্তানেরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কোন কথা কর্ণগোচর হইলে কোপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সন্তানেরা স্বমুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন। পূর্ব্বে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পথে কণ্টক রোপণ করিতেন, এক্ষণে তাঁহাদিগেরই সন্তানেরা সেই পথের কণ্টক অবরোপণ করিতেছেন। আশ্চর্য্য সত্যের মহিমা! সত্যের বলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবিত রহিয়াছে—সত্যের প্রভাবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে সর্ব্বত্র আপনার জয় পতাকা উড্ডীন করিতেছে এবং দিন দিন আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এক মাত্র সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইহা কোন গ্রন্থ-বিশেষে বা ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ নহে। ইহা উন্নত প্রাসাদে রাজার ধন, পর্ণ কুটীরে দরিদ্রের ধন; ইহা গ্রন্থালয়ে পণ্ডিতের ধন ও বর্ণজ্ঞান হীন কৃষকেরও ধন—ইহা অবস্থা-বিশেষ, দেশ-বিশেষ, কাল-বিশেষ, সম্প্রদায়-বিশেষ ও জাতি-বিশেষের আয়ত্ত নহে। ইহা প্রত্যেকের আত্মাতেই স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। জবা-কুসুম-সঙ্কাশ ভাস্কর, নবোদিত পূর্ণিমার শশধর, অন্তরিক্ষ-বিক্ষিপ্ত নক্ষত্র-জাল, চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গের সুস্বর, অতি বিস্তীর্ণ সাগর গিরিশিখর-নিপতিত-নির্ঝর, তরুরাজি-বিরাজিত নব কুসুমিত অরণ্য, ও নব দূর্ব্বাদল-লাঞ্ছিত অতিবিস্তীর্ণ জনশূন্য প্রান্তরই ইহার পুস্তক। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার উপদেষ্টা। মনুষ্য মাত্রেরই ইহাতে সম্পূর্ণ অধিকার। এই প্রকারই ইহার উদারতা, এই প্রকারই ইহার প্রশস্ততা। মনুষ্যের সৃষ্টি অবধি ইহার সৃষ্টি হইয়াছে,

এবং মনুষ্যের আত্মার ন্যায় ইহা অক্ষয় ও অনন্ত জীবন ধারণ করিবে। জ্ঞান ও ভাবই ইহার প্রাণ, স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার লক্ষ্য এবং উন্নতিই ইহার কার্য্য। ইহা প্রত্যেক আত্মাকেই নূতন জীবন, নূতন বল, নূতন স্ফূর্ত্তি, ও নূতন আশা প্রদান করে, প্রত্যেক আত্মাকেই সেই মহান্ আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দে পরিপূর্ণ করে। ইহা মনুষ্যের হৃদয়-কন্দরে কুসংস্কার-রূপ গাঢ়তর অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টিকে প্রশস্ত করিয়া দেয়। ঈশ্বর আত্মার অতি গভীরতম প্রদেশে অবস্থান করিয়া গুরুর ন্যায় শিক্ষা দেন, বন্ধুর ন্যায় সৎপথ প্রদর্শন করেন, পিতার ন্যায় শাসন ও জননীর ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহ বিতরণ করেন—এই ধর্ম্মেরই প্রভাবে আমারদিগের এই রূপ বিশ্বাস। ঈশ্বর বৈরনির্যাতনোদ্দেশে আমারদিগকে দণ্ড প্রদান করেন না—প্রত্যুত স্নেহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমারদিগকে সংশোধন করাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য, এই ধর্ম্মেরই এই রূপ উদার ভাব। তিনি স্বয়ংই পাপীদিগের পাপ হর্ত্তা ও পুণ্যবন্তদিগের পুরস্কর্ত্তা—এই ধর্ম্মেরই এই রূপ প্রশস্ত ভাব। আমরা জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধ-চিত্ত প্রীতিপূর্ণ ও ভক্তি-সম্পন্ন হইলেই অকুতোভয়ে তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আপনারদিগের সুসঙ্গত বিশুদ্ধ কামনা-সকল অকপটে ব্যক্ত করিতে পারি—এই ধর্ম্ম-প্রভাবেই আমারদিগের এই রূপ স্বাধীনতা। এই জগতে ইচ্ছায় ইচ্ছায় যোগ হইলে যেমন আত্মায় আত্মায় যোগ হয়; সেই রূপ ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমারদিগের ইচ্ছার যোগ হইলে এই ক্ষুদ্র আত্মার সহিত সেই মহান্ আত্মার যোগ স্থাপিত হয়, আমরা নয়নে নয়নে প্রাণে প্রাণে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব জন্মে—এই ধর্ম্মেরই এই উপদেশ।

ব্রাহ্মগণ! তোমারদিগের প্রত্যেকের আত্মা-রূপ অতুন্নত পর্ব্বতে আত্মপ্রত্যয়-মূলক সত্য-রূপ উৎস হইতে এই ধর্ম্ম-রূপ স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া সেই প্রশান্ত সাগরে অমৃত সাগরে নিপতিত হইতেছে। এই প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইবার কালে বিষম ভূমি সমুদায় ইহার প্রতিরোধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। যে সমস্ত স্থান দিয়া এই স্রোত নিঃশব্দে অতিক্রম করিতেছে ঐ সমস্ত স্থান উর্ব্বর, বহু-ফল-প্রদ ও জীবন্ত হইয়া যাইতেছে। এই সমস্ত স্থানের ভাব ও মাহাত্ম্য অন্য বিধ। এক্ষণে তোমরা ইহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ করিয়া দেও—ইহার স্বাস্থ্যকর সলিল পান করিয়া সকলে সুশীতল হউক। ধর্ম্ম যেমন যৌবন-তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র তরণী; সেই রূপ গতায়ুঃ বৃদ্ধদিগের বৃদ্ধাবস্থার একমাত্র অবলম্বন। উহা যেমন পুরুষের পৌরুষের মূল, সেই রূপ মহিলাদিগের প্রিয়তার নিদানভূত। ইহা সকলেরই আবশ্যক, সকলেই এই ধর্ম্মের নিমিত্ত তৃষিত চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছে—এক্ষণে তোমরা প্রস্তুত হও, পৃথিবীর তাবৎ জাতিকে, প্রত্যেক মনুষ্যকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী কর। যাহারা অদ্যাপি ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়াছে, তাহাদিগকে তাহার আশ্রয়ে আনিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হও। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হয়, তাহাতে শরীর মন সমর্পণ কর। "কেহ বা বক্তা হইয়া অগ্নিময় বাক্যে সকলের চিত্ত আকর্ষণ কর, কেহ বা সুনিপুণ গ্রন্থকার হইয়া এই ধর্ম্মের সত্য-সকল সাধারণের মনে মুদ্রিত করিতে যত্নবান্ হও এবং কেহ বা পরিব্রাজক হইয়া কৃষকদিগের ন্যায় সামান্য রূপে জীবন কাল

অতিবাহিত করত ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন কর”— স্বাধীনতার অব্যাঘাতে সকলেরই হৃদয়ে প্রবিষ্ট হও। এই সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া যদি কাহারো কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হও, প্রীতি-পূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে, অবমানিত হও, যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবে। ঈশ্বরের কার্য্য সাধন করিতে গিয়া কোন বিপদকেই বিপদ বলিয়া অনুধাবন করিবে না। তোমারদিগের প্রত্যেকেরই হস্তে অতি গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পিত আছে, ইহা বহন করিতে হইলে ধৈর্য্য চাই, বল চাই, প্রগাঢ় যত্ন ও পরিশ্রম চাই। সকলকে লইয়া উন্নত হওয়াই তোমারদিগের যথার্থ গৌরব। জ্ঞান ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, ভিন্ন বলিয়া স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রূপে পরিচিত হওয়া শ্রেয়স্কর নহে।

ভ্রাতৃগণ! তোমরা ব্রহ্ম-জ্ঞানে কত দূর উন্নত হইয়াছ। পাপে নিপতিত হইলে সেই পতিতপাবনকে তো স্মরণ করিয়া থাক। দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ বল প্রকাশ পূর্ব্বক তোমারদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইলে কম্পিত-কলেবরে ঈশ্বরের দ্বারে তো উপস্থিত হইয়া থাক। তোমারদের চতুর্দ্দিকে ঈশ্বর যে সমস্ত সৌন্দর্য্য বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন, উহারা তো প্রণেতার হস্তকে বিস্মৃত করিয়া দেয় না। ইচ্ছা হইলেই তো সেই সর্ব্ব সন্তাপহারক নয়ন-মন-মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাও। ঘোরতর দুঃখে বিপদে নিপতিত হইলে তো তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া থাক। সম্পদে উল্লসিত হইলেও তো চিরানুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার পদানত হও। সত্যের নিমিত্ত, ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, প্রাণ পরিত্যাগ ও সর্ব্ব স্বান্ত করিতেও তো প্রস্তুত আছ। তোমারদের চক্ষের উপর অনন্ত সুখ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, সৎ কর্ম্মই সেই সুখের প্রসূতি, স্বয়ং ঈশ্বরই তাহার আস্পদ। এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট বিনীত হৃদয়ে কাতর ভাবে এই রূপ প্রার্থনা কর, হে ঈশ্বর! তুমিই আমারদিগকে সেই অমৃতের অধিকারী কর; তোমা ভিন্ন আমারদিগের আর কেহ গতি নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় জ্ঞান ভাব ভূষিষ্ঠ এই উৎকৃষ্ট বক্তৃতাটি পাঠ করিলেন—

দেব-লোকে দেবতারা সম্মিলিত হইয়া অহর্নিশি যে ভুবনেশ্বরের আরাধনা করিতেছেন, এখানে এই নরলোকে মর্ত্ত্যলোকে তাহার অনুরূপ সুখ-প্রদর্শন কে আনয়ন করিল? সহস্র সহস্র বিধ কুসংস্কার ও কাল্পনিকতার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কে এই গগনস্পর্শী ব্রহ্মাগ্নি এখানে প্রজ্বলিত করিয়া চারিদিক আলোকময় করিল? কাহার প্রভাবে বহুকাল আচরিত সৃষ্ট বস্তুর পূজার্চনার মধ্যে এখানে অজর অমর, অশোক অভয় “অকাল-মূর্ত্ত” পরমেশ্বরের আরাধনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল? কে এই নির্জীব বঙ্গবাসিগণের নিরুদ্যম চিত্তে প্রকৃত জীবনের সঞ্চার করিল? এই সমস্ত কার্য্যই সেই একমাত্র স্বর্গীয় সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের অপরাজিত পরাক্রম প্রভাবেই সুনিষ্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের—বঙ্গদেশের এই সুখময় কল্যাণময় পরিবর্ত্তন কেবল এক ব্রাহ্ম সমাজের প্রসাদেই আনীত হইয়াছে। আমরা সকলে সেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণ করিয়া—এ দেশের যুগান্তর প্রবেশ দিবস বলিয়াই আজ এই পুণ্যাহ শুভ

১১ মাঘে সকলে আনন্দ মনে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সেই বিশ্ব বিধাতা মঙ্গল-দাতা পরমেশ্বরের পূজা করিতে এই প্রশস্ত উৎসব-সমাজে আগমন করিয়াছি।

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের পরাক্রম! যে স্বর্গীয় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-রূপ স্পর্শ-মণির সংস্পর্শে মানব-হৃদয় মধুময় অমৃতময় হইতেছে, সেই সনাতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুমত আচরণ অনুষ্ঠানে বঙ্গদেশও আনন্দময় উৎসব ক্ষেত্র হইয়া উঠিতেছে। দেখিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের এক একটী উৎসবে এক একটী নগর এক একটী গ্রাম সমুজ্জ্বলিত হইতেছে—এক একটী পরিবার জ্ঞান-ধর্ম্ম সুখ-শান্তিতে সমুন্নত হইতেছে।

বঙ্গদেশের যে যে স্থান অলীক নৃত্য-গীতের আড়ম্বরে—ঘৃণিত ক্রিয়া-কলাপের অত্যাচারে দূষিত কলঙ্কিত হইয়াছিল, যেখানে সহস্র সহস্র আত্মা প্রেয়ের অবলম্বন করিয়া মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিল; সেখানে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই জাগ্রৎ করত শ্রেয়ের পথে পরিচালন করিতেছেন। যে গৃহ, যে পরিবার, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ অভাবে ভগ্ন-উদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল; সেখানে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্গীয় আনন্দ-উৎসবের সহস্র-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত করিতেছেন। যে জাতি প্রকৃত ধর্ম্মালোক অভাবে কুসংস্কারজালে—মোহ-পঙ্কে নিপতিত হইয়া সকলের হেয় অশ্রদ্ধেয় হইয়াছিল; দুর্ব্বলের বল, অগতির গতি জ্ঞানজ্যোতি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সেই জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের অবনত মস্তক উন্নত করিতেছেন—বিকৃত হৃদয় প্রকৃতিস্থ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মাচলে আরোহণ করিবার বল বুদ্ধি শক্তি বিধান করিতেছেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই পূর্ব্বদিক্ হইতে সকল প্রকার বাষ্প কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া সহস্র-রশ্মিতে দিগ্‌দিগন্ত আলোকময় করিয়া উদিত হইতেছেন।

এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বল স্বর্গীয় বল। ইহাঁর পরাক্রম স্বর্গীয় পরাক্রম। জগতে সুখ-শান্তি—আত্মার অনন্ত উন্নতি-সাধন উদ্দেশে সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বর ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অমূল্য অক্ষয় অবিনশ্বর বীজ, প্রতি আত্মার অন্তরতম প্রদেশে অতি যত্নের সহিত নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বয়ংই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক হইয়া উন্নতি সাধন করিতেছেন। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহাকে রক্ষা করিতেছেন বলিয়া জগতের বিবিধ ধর্ম্ম-বিপ্লবেও এই অমূল্য নিধি কাহারো কর্ত্তৃক অপহৃত হয় নাই।

সংসারে কত পরিবর্ত্ত, কত বিপ্লাবনে রাজ্য রাজা বিনষ্ট হইতেছে; কত দেশ বিদেশ উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; তথাচ ব্রাহ্মধর্ম্মের অমূল্য অক্ষয় বীজ বিনষ্ট হয় নাই। পৃথিবীতে কত প্রবল পরাক্রমশালী ধর্ম্মযোদ্ধা-সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনারদিগের বুদ্ধি, প্রত্যক্ষ ও প্রবৃত্তি অনুসারে চালিত হইয়া সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্য, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম প্রচার করিয়া লোকদিগকে মহাভ্রমে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সমস্ত অত্যাচার প্রপীড়নে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত বা বিলুপ্ত হয় নাই। কত স্বার্থপর মহাতেজা প্রচারক-দল এই নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহারা আপনারদিগের বুদ্ধি-চাতুর্য্যে বল-বিক্রমে সহস্র সহস্র মনুষ্যকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করত পুষ্ট-দল হইয়া কত দেশ বিদেশ রাজ্য সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া আপনাদিগের কুটিল মনোরথ সংসিদ্ধ করিয়া ছিলেন। কত

নিরীহ নির্দ্দোষী দৃঢ়-ব্রত সাধুকে স্বধর্ম্মে-দীক্ষিত করিতে অপারগ হইয়া শিরশ্ছেদন করত নিষ্কলঙ্ক শোণিত প্রবাহে মেদিনীকে দূষিত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। কত যথার্থ ঈশ্বরবাদী তন্নিষ্ঠ মহাপুরুষদিগের প্রচারিত প্রকৃত সাধু মত তাঁহারদিগের বিশ্বাস-বিরুদ্ধ বলিয়া অম্লানবদনে কাহাকে কারারুদ্ধ কাহাকে বা অবৈধ উপায়ে বিনষ্ট করিয়াছিলেন—কুত্রাপি বা বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণকে পর্ব্বতসম নরচিতা প্রস্তুত করিয়া অনল-সংযোগে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন—কোন স্থানে বা সাধারণ নরকুলের জ্ঞান-গিরি সদৃশ গ্রন্থ-স্তূপ অগ্নি দাহ দ্বারা এক কালে ভস্মসাৎ করিয়া আপনারদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম-মতকে নির্ব্বিরোধ ও নিঃশত্রু করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নামে জগতীতলে এই সমস্ত অকথ্য কার্য্যাবলী সংঘটিত হইয়াছে, এবম্বিধ হৃদয়-বিদীর্ণকর শোচনীয় ব্যাপার-সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এতাবৎ আসুরিক অত্যাচারে উপদ্রবেও বিলুপ্ত হয় নাই—প্রকৃত সত্যের প্রবাহ কোন রূপে অবরুদ্ধ হয় নাই। বরং ইতিহাস পুরাবৃত্ত-সূত্রে এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা যে পরিমাণে অনুস্যূত হইয়াছে, সেই পরিমাণেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অমূল্য সত্য-রাজির অনির্ব্বচনীয় প্রভা লোক-সমাজে অধিকাধিক-রূপে বিকীরিত হইয়াছে। আমরা এখন সেই ইতিহাস-দর্পণে সত্যের অপরাজিত শক্তি, ধর্ম্মের সুমহান্ মঙ্গলময় মধুময় ভাব, অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এক দেশের, এক জাতির, এক সময়ের নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যোগ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সঙ্গে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আধিপত্য স্বর্গ মর্ত্ত্য সকল লোকেই। যে দিন পৃথিবীর সৃষ্টি, সেই দিনই ব্রাহ্মধর্ম্মের রচনা হইয়াছে। যে দিন ধরা-ধামে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত আত্মার আবির্ভাব, সেই দিন হইতেই এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কোন মনুষ্য-বিশেষও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নিয়ন্তা নহে, যে তাঁহার অনুপস্থানে ইহা হীন-বল হইয়া পড়িবে। কোন মনুষ্যও এ ধর্ম্মের আদর্শ ও নিয়ামকও নহে, যে ঈশ্বরের এই উন্নতিশীল রাজ্যে তদপেক্ষা আর কেহ অধিকতর সাধু-চরিত্র প্রভাবশালী হইলে ইহা নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ন্তা নিয়ামক, আদর্শ প্রবর্ত্তক, সত্য সুন্দর মঙ্গল-পূর্ণ পবিত্র পরমেশ্বর। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায় সুহৃৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বয়ংই। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের বল অদ্যও যেমন, কল্যও সেই রূপ। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন পুরাকালে অসত্য অধর্ম্মের প্রবল পরাক্রমের মধ্য হইতে আপনি ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে উত্থিত হইয়াছেন, তেমনি বর্ত্তমান সময়েরও নানা বিধ উপদ্রব অত্যাচারের অভ্যন্তরেও তিনি অব্যাহত থাকিয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করত কেবল বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নামের জয় ঘোষণা করিতেছেন, ভবিষৎ কালেও তিনি অপরাজিত পরাক্রম সহকারে সকল শত্রু নিপাত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরেরই যশ প্রচার করিবেন।

ভূমণ্ডলে মনুষ্য পশু পক্ষী, দানব দৈত্য অসুর পর্য্যন্ত ঈশ্বরের মহোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আত্ম-শুদ্ধির পরিবর্ত্তে বহুবিধ কৃচ্ছ্র-সাধন ইন্দ্রিয়-লৌল্যকর হৃদয়-বিকৃতকর ব্যাপার-সকল আদরের সহিত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে অমূলক অনর্থকর বিবিধ কুসংস্কারের সূত্র-পাত হইয়াছে; প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অভ্রান্ত বিশ্ব-রূপ গ্রন্থের বিনিময়ে নানা বিধ

কল্পিত উপাখ্যান-স্তূপ ঈশ্বর-প্রণীত অকাল্পনিক ধর্ম্ম-গ্রন্থ-রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে; দোষ-গুণ-বিশিষ্ট ক্ষীণ হীন মলিন মানবও পাপ-ত্রাতা মুক্তি-দাতা বলিয়া পরিপূজিত হইয়াছে। দেখ! এই সমস্ত পর্ব্বত-সমান বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—পৃথিবীর এত দুঃখ দুর্দ্দিনের বিদ্রোহ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বীয় অপরাজিত পরাক্রম-সহকারে একাদিক্রমে কেবল ঈশ্বরের যশ ঘোষণা করিতে করিতে দিন দিন অভ্যুদিত হইতেছেন। এমন ঘন নিবিড় মোহান্ধকার ভেদ করিয়া মঙ্গল-গর্ভ ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন মনোহর বেশে সহস্র রশ্মিতে এখানে প্রকাশিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অতুল্য প্রভাব, অনির্ব্বচনীয় শক্তি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কে না বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়?

ব্রাহ্মধর্ম্মের অপরাজিত পরাক্রম যেমন ভূত কালে, তেমনি এই বর্ত্তমান সময়েও তাহার মঙ্গলময় কল্যাণময় আধিপত্য। জন-সমাজ এক পিতার পুত্র, এক রাজ্যেশ্বরের প্রজা হইয়াও বহুবিধ দূষিত সাম্প্রদায়িক ভাবে যে এত কাল পরস্পর বিবাদ দ্বন্দ্বে, দম্ভ বিদ্বেষে, শতধা বহুধা হইয়া বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচরণ করিতেছিল; ব্রাহ্মধর্ম্ম এক অদ্বিতীয় জগৎপিতার আরাধনার বিশুদ্ধ পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া সকলকে ভ্রাতৃ-ভাবে আবদ্ধ করত তাঁহারই পদানত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনামের মধুর নিনাদে সকল যূথ-ভ্রষ্ট দিশাহারা মানব-কুলকে সচকিত করিয়া এক পথেই আকর্ষণ করিতেছেন। মানব-প্রকৃতি যে এত দিন অপরিষ্কৃত অপরিশুদ্ধ আদর্শের অনুকরণ করিয়া বদ্ধ-ভাবে অবস্থান করত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল; ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার সম্মুখে নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ পরিশুদ্ধ ভূমা ঈশ্বরকে তাহার এক মাত্র আদর্শ রূপে সংস্থাপন করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিতেছেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মনুষ্যের আশা ভরসা, শিক্ষা, উন্নতি, যাহা এই অধোলোকেই আবদ্ধ ছিল; ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নতিশীল আত্মার সম্মুখে অনন্ত উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিতেছেন। তাহার আশা-লতাকে সেই অনন্ত-উন্নত আশ্রয়-তট পরমেশ্বরেরই পদ-তলে সংলগ্ন করিয়া দিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত সুখের পর সুখ, আনন্দের পর কল্যাণতর আনন্দ সম্ভোগে অধিকারী করিতেছেন। এত দিন কাল্পনিক ধর্ম্ম পিতা পুত্রে, ঈশ্বর মনুষ্যে, উপাস্য উপাসকের মধ্যে যে অনতিক্রমণীয় ব্যবধান ঘোষণা করিয়া মানব-কুলকে আধ্যাত্মিক দাসত্ব শৃঙ্খলে চির-বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সমস্ত মধ্যস্থ, সকল আবরণ ও আচ্ছাদন দূরে নিক্ষেপ করত পিতা পুত্রে উপাস্য উপাসকে ঈশ্বর মনুষ্যে যে প্রকৃত সম্বন্ধ ও অধিকার, তাহা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়া সকল প্রকার দাসত্ব ও অধীনতা হইতে মুক্ত করত আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে জন-সাধারণকে এই উপদেশ দিতেছেন, যে যিনি সমুদায় বিশ্ব রাজ্যের একাধিপতি, তিনিই ধর্ম্ম রাজ্যের এক মাত্র রাজা। যিনি সহস্র লোক মণ্ডলের এক মাত্র নিয়ন্তা ও বিধাতা, তিনিই মানব-কুলের পাপ-পুণ্যের অদ্বিতীয় শাস্তা ও পুরস্কর্ত্তা। তাঁহার বিশ্ব-রাজ্য পরিশাসনে যেমন অন্যের হস্ত নাই, তেমনি তাঁহার ধর্ম্ম-রাজ্যের মধ্যে অন্য আর কাহারও আধিপত্য ও কর্ত্তৃত্ব নাই।

সূর্য্য যত পুরাতন হইতেছে, পৃথিবী যত প্রজা দ্বারা পূর্ণ হইতেছে, জ্ঞান যত বিস্তৃত

হইতেছে; ব্রাহ্মধর্ম্ম ততই স্বীয় স্বর্গীয় পরাক্রম বিস্তার করত সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই সমস্ত অক্ষয় অমূল্য উন্নত সত্য প্রচার করিতেছেন। অকাল্পনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল প্রকার কাল্পনিক দূষিত মত খণ্ডন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই জগতী-তলে কেবল "মহেশের মহদ্যশ ঘোষণা" করিতেছেন। ঘোর তামসী অমানিশার পর, পৌর্ণমাসীর পূর্ণ-কল চন্দ্রমার অভ্যুদয়ের ন্যায় এখানে এই মোহান্ধ মর্ত্ত্য লোকে মঙ্গল-গর্ভ ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণ-প্রভায় উদিত হইয়া স্বকীয় সুস্নিগ্ধ সুধাময় আলোকে ঈশ্বরের মঙ্গল-মূর্ত্তি অত্যুজ্জ্বল-রূপে অতি মনোহর-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ সম্মুখে এই যে দেব-স্পৃহনীয় মনোহর দৃশ্য, ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মই এখানে আনয়ন করিয়াছেন। ঈশ্বর-আরাধনাতে দেব-মনুষ্যের যে তুল্য অধিকার, ইহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মই এই জগতীতলে প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন মনোহর দৃশ্য নর-লোকে আর কোথাও নাই, মনুষ্যের এমন উন্নত অধিকার কুত্রাপি কোন ধর্ম্মেই দৃষ্ট হয় না। সেই অনন্ত অরূপী পূর্ণ ব্রহ্ম এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আমারদের নয়ন-তারা জগজ্জীবন পরমেশ্বর এখানে বিরাজ করিতেছেন, আর আমরা সকলে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রীতি কুসুম তাঁহার চরণে অর্পণ করিতেছি। শরীরে শরীরে আত্মার ব্যবধান আছে, আকাশেতে বায়ুরও আবরণ আছে; কিন্তু আমারদিগের আত্মা ও ঈশ্বরে কোন ব্যবধান নাই, কোন আবরণও নাই। চক্ষু উন্মীলন করিলে যেমন তিনি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, তেমনি চক্ষু নিমীলিত করিলে "আত্মার নিভৃত নিলয়ে সুরম্য নিকেতনে তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। এখানে আমরা অন্তঃকৃত বাক্যে যে তাঁহার পূজা করিতেছি, তিনি এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন।" পুত্র যেমন অবাধে অক্লেশে পিতার সম্মুখে গমন করে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তেমনি সরল স্বাভাবিক নিয়মেই আমারদিগকে সেই পরম পিতার অভিমুখীন করিয়াছেন। পৈতৃক ধন সম্পত্তির উপরে পুত্রের যেমন স্বাভাবিক স্বত্ব, ঈশ্বরের অসীম অনন্ত মঙ্গল ভাবেও যে আমারদিগের তেমনি স্বাভাবিক অধিকার, ইহা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছেন। পিতা পুত্রের মধ্যে যেমন মধ্যস্থ নাই, ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে সেইরূপ কোন ব্যবধান নাই—কোন আবরণ ও আচ্ছাদন নাই। এই অমূল্য সত্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই অক্ষয় অধিকার আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই লাভ করিয়াছি। আমরা পৈতৃক ধন সম্পত্তির ন্যায় এখান হইতে সেই পরম পিতার অক্ষয় অনন্ত ভাবের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অনন্ত কাল লোকলোকান্তরে তাঁহারই আদর্শ অনুকরণ করিয়া ক্রমশ দেবত্ব মহত্ত্ব লাভ করিতে থাকিব। সেই অমৃতের পুত্র বলিয়া যেমন আমারদিগের আত্মা অমর হইয়াছে, সেই রূপ আমরা অনন্তের সন্তান বলিয়া অনন্ত উন্নতি লাভে অধিকারী হইয়াছি। ঈশ্বরই আমারদিগের সর্ব্বস্ব। তিনি যেমন আমারদিগের স্রষ্টা, পাতা, অন্নদাতা, প্রভু, পিতা; সেই রূপ তিনিই কেবল আমারদিগের জ্ঞান-দাতা ভয়-ত্রাতা মুক্তি দাতা গুরু। সেই স্নেহময়ী জগন্মাতার নিরাপদ ক্রোড়েই যেমন আমরা লালিত পালিত হইতেছি, তেমনি তাঁহারই মুখের স্নেহময় মধুময় উপদেশ শুনিয়া, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মঙ্গল ভাব দেখিয়া, তাঁহাকে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ আদর্শ করিয়াই আমরা ধর্ম্ম-পথে

অগ্রসর হইতেছি। পিতার গৃহে প্রচুর অন্ন-পান লাভ করিতে পারিলে কে আর অন্যের গৃহে মুষ্টি-ভিক্ষার জন্য লালায়িত হয়? পিতার নিকট হইতে অজস্র-রূপে সুখ-সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হইলে কে আর ভ্রাতার ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে? অগণ্য সূর্য্যালোকে নিত্য-বিচরণ করিতে পাইলে কে আর খদ্যোতের অকিঞ্চিৎকর সামান্য জ্যোতির প্রার্থনা করে? অনাদ্যনন্ত ভূমা পরমেশ্বর স্বয়ংই যাহারদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার সুখ সম্পদের বিধাতা, সেই "ধর্ম্মাবহ পাপনুদ" পবিত্র পরমেশ্বরই যাহারদিগের পাপ-ত্রাতা মুক্তি-দাতা; জ্ঞান ধর্ম্মের জন্য তাঁহার সৃষ্ট একান্ন-পালিত ভ্রাতার দ্বারস্থ হইয়া আপনার ক্ষুদ্রতা লঘুতা প্রকাশ করিতে কেন তাহাদিগের অভিরুচি হইবে? দেবতাদিগের সঙ্গে একাসনে আসীন হইয়া—পিতৃ-ধনে তুল্য অধিকার প্রাপ্ত হইয়া কার আর তুল্য-সম্পদ্ ভ্রাতার নিকটে অকারণে আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে প্রবৃত্তি হইবে?

ব্রাহ্মধর্ম্ম অপৌত্তলিক ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে কোন সৃষ্ট জীবের একাধিপত্য নাই। এ ধর্ম্মে স্বর্গের কুঞ্চিকা বা মুক্তির দ্বারও কোন মনুষ্য বা দেবতা বিশেষের হস্তেও রক্ষিত নাই। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, ঈশ্বর স্বয়ংই তাহার ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল বিধান করেন।

পৃথিবীর প্রথম দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম এক ঈশ্বরের ভাব প্রচার করিয়া আসিতেছেন, বর্ত্তমান সময়েও সহস্রবিধ কাল্পনিক ধর্ম্মকে স্বীয় পদাবনত করিয়া আপনি উন্নত হওত এক ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতেছেন, ভবিষ্যৎ কালেও এই অমূল্য অক্ষয় সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগতে সুনির্ম্মল শান্তি বিস্তার করিবেন। যতদিন না মানব-কুল শান্তং শিবমদ্বৈতং একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ ব্রহ্মের শরণাগত পদানত হইবে, যতদিন না পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অকৃত অমৃত ঈশ্বরের স্তুতি-রবে পরিপূর্ণ হইবে, যত দিন না ভূমণ্ডলে অখণ্ড ভ্রাতৃভাব বিস্তার হইবে; ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উন্নত লক্ষ্য সংসিদ্ধ হইবে না। ঈশ্বরের এই সুমহান্ আদেশ প্রতিপালনের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জগতী-তলে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ঈশ্বরের এই মহদভিপ্রায় সংসাধন করিতে তাঁহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অটল ভাবে দণ্ডায়মান হওত শত-সহস্র শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। পরিণামে যদি আরো কোটি কোটিবিধ বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, আরো বিভিন্নতর নবীন সম্প্রদায় সংরচিত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত কিছুতেই অবরুদ্ধ হইবে না। অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বীয় স্বর্গীয় পরাক্রম-প্রভাবে গম্ভীর-ভাবে উৎসাহ-সহকারে সমর-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কেবল জয় লাভের জন্য নয়— যতক্ষণ না পরাজিত কলুষিত আত্মাকে শোধিত সংস্কৃত করিয়া ঈশ্বরের পদতলে আনয়ন করিবেন, যতক্ষণ না তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ঈশ্বরের অভি-মুখীন করিতে পারিবেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনই নিরস্ত হইবেন না। পৃথিবী হইতে বিবাদ বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব কলহ তিরোহিত হইয়া যত দিন না এই ভূলোক দেব-লোক স্বর্গ-লোকের প্রতিরূপ হইয়া উঠিবে; তত দিন ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গল-সংকল্প সুসম্পন্ন হইবে না।

ব্রাহ্মগণ উৎসাহিত হও—ঈশ্বরের মহিমা-কে মহীয়ান্ করিতে হৃদয়কে বিশুদ্ধ কর, রসনাকে প্রমুক্ত কর, আত্মাকে উন্নত কর।

তোমরা যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ—সেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাবেই তোমারদের সকল আশা পূর্ণ হইবে জগতে অপার শান্তি বিস্তার হইবে। সেই এক ঈশ্বরের পূজা হইতেই তোমরা ঐহিক পারত্রিক সকল সুখ সম্পদ লাভ করিবে। যিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, ভূলোক ও দ্যুলোকের একাধিপতি, তাঁহারই লক্ষ্য সম্পন্ন করিতে তোমারা দণ্ডায়মান হইয়াছ, তাঁর রাজ্যে তাঁরই যশ প্রচার করিতে তোমরা উত্থিত হইয়াছ। তিনিই তোমারদিগের সহায় সুহৃদ সকলই। যাঁর নামে ওষধি বনস্পতি প্রফুল্লিত হয়, তাঁর নামে মনুষ্যের নিদ্রিত-আত্মা কেন না জাগ্রত হইবে।

দেখ! প্রত্যক্ষ দেখ! যখন এই বঙ্গভূমি ঘোর মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া কাল যাপন করিতেছিল, যখন পৌত্তলিকতার একাধিপত্যে সমুদায় বঙ্গদেশ নিস্তব্ধ ভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, সেই ঘোর নিস্তব্ধ রজনীতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একাকী এখানে উচ্চৈঃস্বরে জয় জগদীশ বলিয়া উত্থিত হইলেন। তাঁর সেই গম্ভীর নিনাদে বঙ্গ-দেশের চির-নিদ্রা ভঙ্গ হইল—সহস্র সহস্র আত্মা জাগ্রৎ হইল, সেই মহেশের মহদ্যশ ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এখানকার এই ব্রহ্ম ও ব্রাহ্ম নামের কলরবে পৃথিবীর সমুদ্র-পর্ব্বত-ব্যবহিত স্থান-সকলও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দেখ, আজ-কাল ভূলোকের চারি দিক্ ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনায় কেমন পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর অন্য কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক ভাব প্রচার করিতেই সকলে ব্যগ্র ও ব্যাকুল হইয়াছেন, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরেতে অর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। যে পরিমাণে এই মহান্ লক্ষ্যটী সুসম্পন্ন হইবে, সেই পরিমাণেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-পথ প্রমুক্ত ও প্রশস্ত হইতে থাকিবে, পৃথিবীর সেই চির-প্রার্থনীয় কাল ততই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে, মানব কুল ততই গম্ভীর-শান্তি সাগরে অবগাহন করিবে।

হে বিপদ্-বারণ দুঃখ-ভঞ্জন পরমেশ্বর! তুমি তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখানে প্রেরণ করিয়া আমারদের সকল বিপত্তি, সকল দুঃখ নিবারণ করিয়াছ, আমরা তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বল বীর্য্য স্বাধীনতা, সুখ সম্পদ্ সৌভাগ্যের অভাবে আর আমরা কাতর নহি, তোমাকে পাইয়াই আমারদের সকল অভাব ও অনটন বিদূরিত হইয়াছে। এমন যে ক্ষীণ হীন, মলিন পরাধীন বঙ্গ-ভূমি, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবে ইহার সৌভাগ্যের সহস্র-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তোমার প্রসন্ন-মুখ দেখিয়াই আমরা সকল দুঃখ মনস্তাপ বিস্মৃত হইয়াছি। তোমার প্রতি ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গলের নির্ভর করিয়া—তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আমরা নিরাপদ্ ও নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছি। আমরা দেখিতেছি—প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিতেই বঙ্গ-দেশের উন্নতি, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়েই আমারদের জয়।

হে অকিঞ্চন-গুরু! যেমন তুমি এই বঙ্গ-দেশে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ইহার মঙ্গল সাধন করিলে, তেমনি তুমি সমুদায় পৃথিবীতে—সকল আত্মাতে তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া পৃথিবীর উন্নতি সাধন কর, মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা কর। আজ যেমন তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে বঙ্গ-দেশে সহস্র সহস্র আত্মা তোমার যশ কীর্ত্তন করিতেছে, এমনি দেবস্পৃহনীয় মহোৎসব-দ্বার তুমি সকল দেশে—সমুদায় পৃথিবীতে

প্রযুক্ত করিয়া এখান হইতে বিবাদ বিষবাদ বিদ্বেষ অসূয়া বিদূরিত করিয়া জগতে অক্ষয় সুখ শান্তি বিস্তার কর। সমুদায় মানবকুলকে তোমার শরণাগত পদানত করিয়া তোমার পবিত্র নামের মঙ্গল ধ্বনিতে সমুদায় লোকমণ্ডল প্রতিধ্বনিত কর। এই ভূলোকে, দেব লোক—স্বর্গ লোকের আভাস প্রদর্শন কর। বিনীত ভাবে যোড় করে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর চারিটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

থিওডোর পার্কর।

২৮২ সংখ্যক পত্রিকার ২০৮ পৃষ্ঠার পর।

যে জাতির যেরূপ আদিম অবস্থা সে তদনুসারে ধর্ম্মের সহিত নানাপ্রকার কল্পনা সংযোগ করিয়া দিয়াছে। কোন কোন জাতি কহিয়া থাকে যে তাহারা ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই নিমিত্ত তাহারা যে স্থানে বাস করে তাহার আদিম অধিকারী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। কেহ কেহ আপনাদিগকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। কোন কোন জাতি কহে যে প্রকৃত অসভ্যাবস্থা হইতেই তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে, স্বয়ং ঈশ্বর তাহাদিগকে সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন। কাহারও মত এই রূপ যে, প্রকৃত সভ্যাবস্থাই মানব জাতির আদিম অবস্থা। এই সত্যটি হিন্দু দিগের মধ্যে প্রচলিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা উহাদের নিকট হইতেই এই মত অধিকার করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা কহিয়া থাকেন যে আদি অবস্থা যারপর নাই সুখের অবস্থা ছিল। মানবজাতি সেই অবস্থা হইতে স্বদোষে এক কালে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রথম অবস্থার ধর্ম্মই মনুষ্যের বৈধ ধর্ম্ম।

এই স্থলে একটি জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে। মানবজাতির আদিম অবস্থা কোনটি। উহারা প্রকৃত সভ্য ও এক ঈশ্বরের উপাসনার অবস্থাতে কি উৎপন্ন হইয়াছে? না অসভ্য ও জড়োপাসনার অবস্থাতে উৎপন্ন হইয়াছে? মানব জাতি অবনত হইয়াছে? কি ক্রমশ উন্নত হইতেছে? এই সমস্ত প্রশ্ন ইতিহাস-মূলক; সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহার সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। অপ্রামাণিক সিদ্ধান্ত ভিত্তি-বিরহিত চিত্র-রচনার ন্যায় সিদ্ধান্ত নিরর্থক। আমাদিগের অধিষ্ঠান-ভূতা এই পৃথিবীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা প্রতিক্ষণই পূর্ণাবস্থায় ক্রমশ উন্নত হইতেছে। এক সময়ে ইহার এই রূপ আকার হইয়াছিল যে, তরু গুল্মাদি ও পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তু ব্যতিরেকে ইহার আর কোনরূপ অধিবাসী ছিল না। তৎপরে যখন ইহা কালের পরিণামানুসারে ক্রমশ পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইতে লাগিল, তখন ইহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া উঠে। মনুষ্যের অবস্থা বিষয়েও এই দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ উপাদেয় বোধ হইতে পারে। মানবজাতি যে নিতান্ত অনুন্নত অবস্থা হইতে ক্রমশ উন্নত অবস্থা অধিকার করিতেছে, ইহা দ্বারাই তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। এই নিদর্শন অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ কহিয়াছেন যে, মনুষ্য প্রথমত নিকৃষ্ট অসভ্যাবস্থায় সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃতির উপাসনাই ইহার আদিম ধর্ম্ম এবং প্রতিবেশীর প্রতি রাক্ষসবৎ ব্যবহারই ইহার নীতি ছিল একণে যে সমস্ত সভ্য জাতি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহারা সকলেই আদি নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে ক্রমশ অভ্যুদয় লাভ করি

য়াছে এবং প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম অধিকার করিবার পূর্ব্বে জড়োপাসনা ও পুরুষোপাসনার দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কতক গুলি স্বমতাভিমানী কবিগণ কহিয়া থাকেন যে, আদিকালে একটি স্ত্রী ও এক পুরুষ সৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ দম্পতী ধর্ম্ম, নীতি ও অন্যান্য শক্তি সম্পূর্ণ রূপ অধিকার করে। তৎপরে উহারা ঐ অবস্থা হইতে স্খলিত হয়। কিন্তু তৎকালে কএকটি লোক সত্যকে জীবন্ত ভাবে রক্ষা করিয়াছিল। যখন মানব জাতি পাপভার-গ্রস্ত ও অসভ্যাবস্থায় নিপতিত হয়, তখন ঐ সমস্ত সত্য জনশ্রুতিতে প্রবাহিত হইয়া উহাদিগকে ক্রমশ উদ্ধার করে। এখনও কতকগুলি সৌভাগ্য-সম্পন্ন মনুষ্য সেই সমস্ত সত্য লাভ করিয়া পাপ ও অসভ্যতা হইতে মানবজাতিকে পরিত্রাণ করিতেছেন।

হিব্রুজাতির পৌরাণিক গ্রন্থ ব্যতিরেকে এই মত কোনগ্রন্থই সপ্রমাণ করিতে পারে না। কিন্তু কেবল ফিনীসিয়, পারসীক ও চীনদিগের মধ্যে যে এই রূপ এক কিম্বদন্তী আছে, তাহাই এই মতের কথঞ্চিৎ পোষকতা করিতে পারে। এক্ষণে আমরা যদি এই সমস্ত কিম্বদন্তীর অপ্রকৃত প্রমাণ সমুদায় স্বীকার করি, তাহা হইলে বিষয়টি অসত্যে পর্য্যবসিত হয়। যাঁহারা এই মত স্বীকার করেন, তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, অনেক জাতির মধ্যে এই রূপ প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে সত্যযুগ ছিল। যাহাই হউক, যদি এই মত সাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকে, তাহা হইলেও ইহা সপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। মনুষ্যের স্বভাবই এই যে আপনার নীচ অবস্থা অপেক্ষা পূর্ব্বাবস্থাকে উৎকৃষ্ট করিয়া দেখে; সে পূর্ব্বাবস্থাকে অলঙ্কৃত করিয়া বর্ণনা করে এবং পূর্ব্বাবস্থাকে স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। কোন কোন জাতির মধ্যে যে এই মত প্রচলিত দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা তাহাদিগের ঐ রূপ মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। গ্রিক জাতীয়েরা সত্যযুগকে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করে; কিন্তু হিব্রুদিগের মধ্যে অনেকানেক ধর্ম্মশীল মনুষ্যেরা সম্মুখেই স্বর্গ রাজ্য উপস্থিত হইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, যদি সবিশেষ অনুসন্ধান করা হয়, তাহা হইলে মানব জাতি যে নিকৃষ্ট অবস্থা হইতে ক্রমশ উৎকৃষ্ট অবস্থায় উপনীত হইতেছে, এই মতটি অনেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত দেখা যাইতে পারে।

কেহ কেহ এই রূপও কহিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বতন কোন সুসভ্য জাতির সাহায্য ব্যতিরেকে কোন জাতিই অসভ্যাবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এই বাক্য নিতান্ত অপ্রামাণিক। চীন, মেক্সিকো ও পেরু দেশীয়েরা কোন্ জাতির নিকট সাহায্য লাভ করিয়া উন্নত হইয়াছিল? অন্য দেশের সহায়তায় কোন কোন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে দেশের সহায়তা লব্ধ হইতেছে, তাহার শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে কোন্ দেশ আদর্শ হইয়াছিল? আমাদিগের এই রূপ বিশ্বাস আছে যে যদি কোন জাতি সহস্র বৎসর কাল আলোকের নিমিত্ত আলোকের উপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থ পর্য্যবসিত করে, তাহা হইলেও চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে সে এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও রমণীয় নগরী প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২০। কলিগতাব্দ ৪৯৬১। ২৩ ফাল্গুন বুধ বার।

ষষ্ঠ কল্প
চতুর্থ ভাগ
চৈত্র ১৭৮৮ শক।

২৮৮ সংখ্যা   ৩৭ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
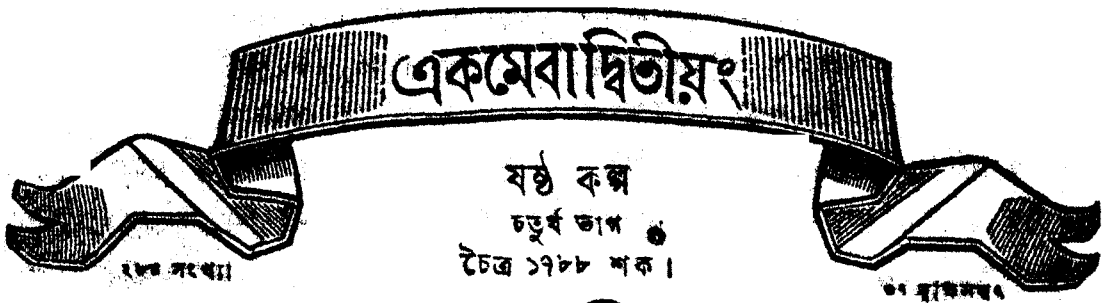
ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে দ্বিতীয়ং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মরুতোদেবতা।

১০০৭

১। মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে পাথা দিবো বিমহসঃ। স সুগোপাতমো জনঃ।

১। হে ‘বিমহসঃ’ বিশিষ্টপ্রকাশাঃ ‘মরুতঃ’ ‘দিবঃ’ অন্তরিক্ষলোকাদাগত্য ‘যস্য’ ‘হি’ যস্য খলু যজমানস্য ‘ক্ষয়ে’ যজ্ঞগৃহে ‘পাথ’ সোমং পিবথ ‘সঃ’ ‘জনঃ’ জাতো যজমানঃ ‘সুগোপাতমঃ’ শোভনৈঃ পালকৈঃ অত্যন্তং যুক্তো ভবতি।

১। হে দীপ্তিশীল মরুদ্গণ। তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া যে যজমানের গৃহে সোম পান করিয়া থাক, সেই ব্যক্তি সুরক্ষিত হয়।

১০০৮

২। যজ্ঞৈর্বা যজ্ঞবাহসো বিপ্রস্য বা মতীনাং। মরুতঃ শৃণুতা হবং।

২। হে ‘যজ্ঞবাহসঃ’ যজ্ঞস্য বোঢ়ারঃ ‘মরুতঃ’ যূয়ং ‘যজ্ঞৈঃ’ ‘বা’ বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে। যজ্ঞৈশ্চ যজমানস্য ‘মতীনাং’ স্তুতীনাং সম্বন্ধিনঃ ‘বিপ্রস্য’ বা অযজমানস্য মেধাবিনশ্চ ‘হবং’ আহ্বানং শৃণুত। যজ্ঞবতো যজমানস্য যাগরহিতস্য স্তোতুশ্চাহ্বানং ভবদ্ভিঃ শ্রোতব্যং যতো ভবন্তো যজ্ঞস্য বোঢ়ারঃ স্তুতিপ্রিয়াশ্চেতি ভাবঃ।

২। হে যজ্ঞবাহক মরুদগণ! তোমরা যজমান ও স্তোতার আহ্বান শ্রবণ কর।

১০০৯

৩। উত বা যস্য বাজিনোঽনু বিপ্রমতক্ষত। স গন্তা গোমতি ব্রজে।

৩। ‘উত’ ‘বা’ অপিচ ‘যস্য’ যজমানস্য ‘বাজিনঃ’ হবির্লক্ষণান্নোপেতা ঋত্বিজঃ ‘বিপ্রং’ মেধাবিনং মরুদ্গণং ‘অন্বতক্ষত’ হবিঃপ্রদানাদিনা তীক্ষ্ণীকুর্ব্বন্তি। ‘সঃ’ যজমানঃ ‘গোমতি’বহুভিঃ গোভিঃ যুক্তে‘ব্রজে’ গোষ্ঠে ‘গন্তা’ গমনশীলো ভবতি।

৩। যে যজমানের হবিরূপ অন্নসম্পন্ন ঋত্বিক্গণ মেধাবী মরুদ্গণকে হবি প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই যজমান বহুসংখ্য গোসম্পন্ন গোষ্ঠে গমন করেন।

১০১০

৪। অস্য বীরস্য বর্হিষি সুতঃ সোমো দিবিষ্টিষু। উক্থং মদশ্চ শস্যতে।

৪। 'দিবিক্ষিষু' যজ্ঞীয় দিবসেষু 'বর্হিষি' যজ্ঞে 'বীরস্য' শক্রক্ষেপণ কুশলস্য অস্য মরুদ্গণস্য যাগার্থ'সোমঃ' 'সুতঃ' ঋত্বিগ্ভিঃ অভিষুতো ভবতি। 'উক্থং' মরুদ্দেবতাকং শস্ত্রং 'মদশ্চ' মদি মারুত্মা যুক্তা মরুতো দেবাঃ সোমস্য মৎসদিত্যাদিকা মারুতী নিবিচ্চাস্য মরুদ্গণস্য প্রীতয় 'শস্যতে' হোত্রা পঠ্যতে। 'দিবিক্ষিষু' ইত্যঃ এষণানি গমনানি দিবো দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য যেষু দিবসেষু তে তথোক্তাঃ।

৪। যজ্ঞীয় দিবসে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে মহাবীর মরুদ্গণের যাগার্থ সোম সংস্কৃত হয় এবং মরুদ্দৈবত উক্থ শস্ত্র ও মারুত-মন্ত্র মরুদ্গণের প্রীতির নিমিত্ত হোতা কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া থাকে।

১০১১

৫। অস্য শ্রোষন্ত্বা ভুবো বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভি। সূরং চিৎসস্রুষীরিষঃ। ১। ৬। ১১।

৫। 'অস্য' যজমানস্য স্তুতিং মরুতঃ 'আ' আভিমুখ্যেন 'শ্রোষন্তু' শৃণ্বন্তু। 'যঃ' মরুদ্গণঃ 'বিশ্বাঃ' 'চর্ষণীঃ' সর্ব্বান্ শত্রুভূতান্ মনুষ্যান্ 'অভিভুবঃ' অভিভবতি। তাদৃগগুণকারা মরুতঃ শৃণ্বন্তু ইত্যর্থঃ। 'সূরং' 'চিৎ' স্তোতেঃ প্রেরয়িতারং যজমানমপীতো মরুদ্ভিঃ প্রত্তান্যন্নানি 'সসৃষীঃ' প্রাপ্তানি ভবন্তু। ১। ৬। ১১।

৫। যাঁহারা সকল শত্রুভুত মনুষ্যগণকে অভিভব করিয়া থাকেন, সেই মরুদ্গণ যজমানের স্তুতিবাক্য সম্যক শ্রবণ করুন। ইহাঁরদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত অন্ন স্তুতিবাদক যজমানকে প্রাপ্ত হউক। ১। ৬। ১১।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

১ মাঘ ১৭৮৮ শক।

অদ্য আমারদিগের কি সুপ্রভাত! অদ্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সূর্য্যের সূর্য্য, জ্যোতির জ্যোতি পরমেশ্বরের আহ্বানেই গাত্রোত্থান করিয়াছি। যিনি তরুণ প্রভাকরকে এই প্রাতঃকালে প্রেরণ করিয়া জগতের অন্ধকার বিদূরিত করিলেন, তিনি স্বয়ংই আমারদিগের অন্তরাকাশে অভ্যুদিত হইয়া হৃদয়ের মোহান্ধকার বিনষ্ট করিলেন। এখন তাঁহারই প্রকাশে আমরা অন্তর্ব্বাহ্য সকলই আলোকময়—সুধাময় অবলোকন করিতেছি। বাহিরে আমারদিগের নবোন্মীলিত চর্ম্ম-চক্ষু যাঁহার হস্তের চিহ্ন অবলোকন করিতেছে, অন্তরে আত্মার নিভৃত-নিলয়ে বিজ্ঞান-নয়ন, সেই জ্যোতির সাগর প্রেমের আকর পরমেশ্বরেরই মঙ্গল মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত কৃতার্থ হইতেছে।

এই প্রাতঃকাল তো প্রতিদিনই পর্য্যায়ক্রমে আমারদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রতিদিনই তো প্রভাকর উজ্জ্বল-বেশে উদিত হইয়া জগতের শোভা সম্পাদন ও সুখসাধন করিতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সূর্য্যোদয় সন্দর্শন-জনিত এমন পবিত্র মধুর আনন্দ প্রত্যহ অনুভব করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা অনুভূত হইবে? পশু পক্ষী সকল সূর্য্যের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে বলিয়াই সূর্য্যোদয়ে তাহারা জীবন ও জ্যোতি পাইয়া জাগ্রৎ ও প্রফুল্লিত হয়, আমরা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলিত তৃষিত হইয়া জাগ্রৎ হই না বলিয়াই এমন দেব-স্পৃহনীয় পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি না। সূর্য্যের প্রকাশে যখন চারিদিক্ প্রকাশিত হয়, আমারদের আত্মা তখন আত্ম-জ্যোতি বিহীনে চারিদিক্ অন্ধকার অবলোকন করে। চিত্র পুত্তলিকাকে বিবিধ সুরম্য সুসজ্জিত স্থানে আনয়ন করিলে সে কি সন্দর্শন করিবে? মৃত-মধুমক্ষিকাকে মধুপূরিত পর্ব্বত-সমান কুসুম রাশির মধ্যে সংস্থাপন করিলে কি ফল লাভ হইবে? ঈশ্বরই যে চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, তাঁর আবির্ভাবেই যে আত্মা জীবিত, তাঁর অভাবেই যে সে মৃত হইয়া পড়ে; সেই জন্যই যখন সেই

প্রাণের প্রাণকে লাভ করিতে না পারি, তখন এই সকলই প্রাণ-শূন্য শোভাশূন্য অর্থ শূন্য বোধ হয়। যখন তাঁর অনুরাগ-আলোকে চারিদিক্ অবলোকন করি, তখন সকলই সুসজ্জিত মধুরামৃত দেখিতে পাই।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে বৃক্ষ লতা সকল শিশির-ধৌত হইয়া পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়, আমরা এই রমণীয় সময়ে কোথায় উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ঈশ্বর-পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রীতি-সরোবরে অবগাহন করত পরিস্নাত ও পরিস্নিগ্ধ হইব, না আগ্রহের সহিত বিষয় অনলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাতঃকালের এমন স্বাভাবিক স্নিগ্ধ ভাবকেও উগ্র করিয়া তুলি। কোথায় হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তিকে উন্নত করিব, কোথায় ঈশ্বরের স্নিগ্ধ মঙ্গল জ্যোতিতে প্রীতি-কলিকাকে প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত করিব, না স্বার্থপরতা বিষয়কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রত্যুষের এমন প্রসন্ন ভাবকেও বিষণ্ণ করিয়া ফেলি। সেই জন্যই প্রেমময় অমৃতময়ের সাক্ষাৎকার লাভ-জনিত প্রাতঃকালের এমন অমৃতময় মধুময় ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হই না।

আমারদিগের সাধু ইচ্ছা থাকিলে, তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণগত স্পৃহা থাকিলে, সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তিনি আমারদিগের আশা পূর্ণ করেন। কাল রজনী যোগে যখন বিশ্রাম-শয্যায় শয়ন করি, তখন এই আশা উদ্যমে প্রফুল্লিত হইয়া নয়ন-যুগল নিমীলিত করিয়াছিলাম, যে, কল্য প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উত্থিত হইয়া সেই দেব-দেবের পূজার্চ্চনা করিতে ব্রহ্ম-মন্দিরে গমন করিব। কোথায় আমরা নিদ্রাবেশে হত-চেতন—হতজ্ঞান হইয়া আলস্য-শয্যায় শায়িত ছিলাম, কোথায় অন্ধকারের মধ্যে অবস্থান করিতে ছিলাম, সেই অন্তর্যামী পুরুষ—সেই স্নেহময়ী জননী আমারদিগের হৃদয়ের ভাব, আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা অবগত হইয়া প্রত্যুষেই স্বয়ং স্নেহভরে আহ্বান করিলেন, "বৎস উত্থান কর, রজনী অবসান প্রায় হইয়াছে, আমি তোমারদের পূজা গ্রহণের জন্য উপস্থিত হইয়াছি।" আমরা তাঁর সেই সস্নেহ মধুর আহ্বানে রোমাঞ্চিত-শরীরে সচকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলাম। তাঁহাকেই প্রণাম প্রণিপাত করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দূরদূরান্তর হইতে এখানে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছি। তিনিও আমারদিগের প্রার্থনানুরূপ তাঁহার সেই সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী মঙ্গল মূর্ত্তি এখন আমারদিগের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মাতার ন্যায় স্নেহের সহিত এই সুপ্তোত্থিত সন্তান-সকলকে তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছেন। হে সাধু-সজ্জন সকল! তোমরা এখন যাঁর ক্রোড়ে সুখে অবস্থান করিতেছ, একবার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, স্নেহময়ী জগন্মাতা তোমাদিগকে কেমন অনিমিষ-নেত্রে, সস্নেহে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়শায়ী হইয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না, জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁর পবিত্র প্রফুল্ল আনন সন্দর্শন করিয়া জীবনকে স্বার্থক কর। বালকেরা যেমন ব্যাকুলিত হইয়া এই প্রাতঃকালে মাতার নিকটে অন্নপান যাচ্ঞা করিতেছে, আইস আমরা সকলে সরল ভাবে বিনম্র হৃদয়ে তদপেক্ষা অধিকতর আগ্রহের সহিত আত্মার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য তাঁহার নিকটে তাঁহাকেই প্রার্থনা করি। যিনি সহস্র জীবের সহস্রবিধ কামনা পূর্ণ করিতেছেন, আমরা কি অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে যোড়করে তাঁর দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইব?

তিনি আমারদের এমন মাতা নন, যে তাঁর নিকটে কেহ যাচ্ঞা ও প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হয়। প্রার্থনা না করিলেও যিনি আমারদিগের অভাব অবগত জানিয়া প্রতিক্ষণ অসংখ্য অযাচিত সুখ বিধান করিতেছেন, তখন কি তাঁহাকে আমারদিগের হৃদয়ের এই গূঢ় গম্ভীর অভাব অবগত করিলে তিনি তাহা পূর্ণ করিবেন না? যশ মান ধন ঐশ্বর্য্য নয়, কেবল তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে কি তিনি আমারদিগকে নিরাশ করিবেন? কখনই না। তিনি আমাদের ব্যাকুলতা কাতরতা দেখিলে, তিনি আমারদের অন্তস্ফূর্ত্ত সকরুণ প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমারদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া সকল অভাব বিদূরিত করিবেন, সকল আশা পূর্ণ করিবেন। হে স্নেহময়ী জগন্মাতা! আমরা সমস্ত রজনী নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া তোমাকে দেখিতে পাই নাই, তুমি কৃপা করিয়া আমারদিগের নিকটে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হও। আমরা তোমার জন্য ক্ষুধিত পিপাসিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, তুমি দর্শন দিয়া আমারদের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ কর। আমরা তোমার পূজার জন্য প্রাতঃপ্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুম লইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, তুমি আমারদের পূজা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর। আমরা অবিচ্ছেদে তোমার মঙ্গলরূপ সত্য স্বরূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমারদিগের নিকট চির প্রকাশিত থাকিয়া এ জীবনকে সার্থক কর। এই প্রাতঃ সূর্য্যের ন্যায় আমারদের নিকটে ক্রমে ক্রমে তুমি তোমার পূর্ণ প্রভা প্রকাশ কর, যে আমরা দিন দিন অধিকতর উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত তোমার ধ্যান ধারণায়, পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত থাকিয়া এ জীবন কাল অতিবাহিত করি। হে ঈশ্বর! তুমি আমারদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

একাদশ উপদেশ।

ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও মহাপ্রলয়।

"যে পূর্ণপুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সমুদায় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না।"

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরকে সৃষ্টি-কর্ত্তা, স্থিতি-কর্ত্তা বলিয়া যেমন প্রতিপন্ন করেন, সেই প্রকার প্রলয়-কর্ত্তা বলিয়া যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? অবশেষে ঈশ্বর এই সমুদয় জগৎ সংসারকে একেবারে যে ধ্বংশ করিবেন, এক সময়ে যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবেই হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহা সিদ্ধান্ত নহে, কিন্তু ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি প্রতিপন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য—ঈশ্বরের শক্তিতে কিছুই অসাধ্য নাই, ইহাই প্রতিপন্ন করা ইহার উদ্দেশ্য। এই জন্য উক্ত হইয়াছে "যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সমুদায় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্ব্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না।"

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না এবং আপনা হইতেও উৎপন্ন হয় নাই; সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ইহাকে অসৎ অবস্থা হইতে উৎপন্ন করিয়া রক্ষা করিতেছেন। সমুদায় জগৎ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে বস্তুতে যত প্রকার শক্তি আছে, তাহা তিনিই প্রয়োজন অনুসারে বিতরণ করি-

রাছেন। কি আত্মা কি জড় উভয়েই তাঁহার অলৌকিক শক্তি দ্বারা নিজ নিজ সত্তা ও সমুদায় শক্তি লাভ করিয়া বিচিত্র কার্য্য-সকল চির কাল সম্পাদন করিতেছে। সেই সত্তা ও সেই সমস্ত শক্তি স্বতন্ত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের নিতান্ত পরতন্ত্র। যেমন বাক্য-প্রয়োগ, গতিক্রিয়া ও হস্ত-সঞ্চালন আমাদের ইচ্ছার নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র-রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, প্রত্যুত আমাদের ইচ্ছার নিতান্ত পরতন্ত্র হইয়া থাকে, সেই রূপ জগতের কোন পদার্থ ঈশ্বরেচ্ছা-নিরপেক্ষ হইয়া সত্তা ও শক্তি অধিকার করিতে পারে না। আমাদের ক্রিয়ার সহিত আমাদের যে রূপ যোগ, সমুদায় জগতের সহিত ঈশ্বরের সেই রূপ যোগ। সমস্ত জগৎ পরম কারণ পরমেশ্বরেরই কার্য্য। আমরা কর্তৃত্ব সহকারে যে সকল কার্য্য করি ও জড় জগৎ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সকল ঘটনা উপস্থিত করে, ঈশ্বর তৎসমুদায় কার্য্যের সাক্ষাৎ কর্ত্তা নহেন বটে, কিন্তু আমাদের ও আমাদের কর্তৃত্ব শক্তির এবং জড় জগতের ও সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের সাক্ষাৎ কর্ত্তা। আমাদের ক্রিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ কার্য্য নহে কিন্তু আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ কার্য্য। ঈশ্বর কোন সৃষ্ট বস্তুকে সৃষ্টি শক্তি দেন নাই, এই জন্য তাহারা কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে পারে না; সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর বস্তু-সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের সত্তা ও শক্তি আমাদের নিতান্ত অনায়ত্ত; কিন্তু তাহা আমাদের ইচ্ছারত্ত ক্রিয়ায় পরমেশ্বরের অতিমাত্র আয়ত্ত। অতএব আমরা যেমন ইচ্ছা করিলেই আমাদের ক্রিয়া-সকল প্রতিসংহার করিতে পারি; সেই রূপ ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কি আত্মা কি জড় সমুদায় পদার্থ স্ব স্ব শক্তির সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাঁহার যে শক্তি এই সৃষ্টি-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহাতেই অব্যক্ত রূপে অবস্থান করিবে;—পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার জগতের অসৎ অবস্থা উপস্থিত হইবে।

কিন্তু অদ্যাপি ঈশ্বরের পালনী ইচ্ছা বর্ত্তমান রহিয়াছে; এই সুস্নিগ্ধ ইচ্ছা যে ভবিষ্যতে ভীষণ সংহার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, তাহার তো কোন লক্ষণই লক্ষিত হইতেছে না। এবং তিনি সৃষ্ট পদার্থকে যে সকল শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সমস্ত জগতে যে সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে সমুদায় পদার্থ বদ্ধ হইয়া আছে, তৎসমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা কর, তাহাতে সংহারের কোন কারণই উপলব্ধ হইবে না, প্রত্যুত তাহাতে কেবল মঙ্গলেরই চিহ্ন—উন্নতিরই নিদর্শন দেখিতে পাইবে। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে, জগতের মধ্যেও জগৎ-সংহারের কোন কারণ বিদ্যমান নাই। কি আত্মা কি জড় কাহারও এমন কোন শক্তি নাই যে, ইহারা পরস্পরকে বা আপনাকে ধ্বংস করিতে পারে। যে শক্তি আছে, তদ্দ্বারা বস্তু সকলের অবস্থান্তর উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু কোন নূতন বস্তু উৎপাদন বা পুরাতন বস্তু ধ্বংস হইতে পারে না। ফলতঃ ঈশ্বর স্বহস্তে ধ্বংস না করিলে জগতের এক কণামাত্র পদার্থও কদাপি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে ইহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। কেন না ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও জগৎ তাঁহার সম্পূর্ণ পরতন্ত্র।

বস্তুত মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা নাই; ঈশ্বরকে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলা কেবল তাঁহার অনন্ত শক্তির পরিচয় দিবার নিমিত্ত। তিনি যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, তেমনি

পূর্ণমঙ্গল। তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু যাহা মঙ্গল, তিনি কেবল তাহাই ইচ্ছা করেন। উদার প্রীতি, অসীম করুণা, অখণ্ড ন্যায়, পরিপূর্ণ মঙ্গল ভাব কদাপি তাঁহার ইচ্ছা হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। যে ঘটনায় পাপ ও পুণ্য একই ফল প্রসব করিবে, যে ঘটনায় দয়া ও নিষ্ঠুরতা একাকার হইবে, জ্ঞান-সমুদ্র মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে তাহা কখনই উপস্থিত হইবে না। সেই "একোবশী" পরমেশ্বর কোন বিকারের বশম্বদ নহেন, তিনি স্বতন্ত্র স্বরূপ; পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা তাঁহার চক্ষু, অপ্রতিহত ইচ্ছা তাঁহার হস্ত, মঙ্গল কার্য্যই তাঁহার সংকল্প। তিনি বিনা প্রমাদে সমুদায় দর্শন করেন এবং অবাধে স্বীয় সঙ্কল্পিত মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি মঙ্গলের প্রসূতি, ধ্বংস তাঁহার ভাবের বিপরীত বস্তু, আমাদের কল্পনা মাত্র। সেই অনন্ত-মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর অনন্ত কালের জন্য বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে কোন কালেই ধ্বংস হইতে দিবেন না। আত্মা-সকল চির কালই অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। জড় জগৎ চির কালই বিবিধ প্রকারে আত্মার আনুকূল্য করিতে থাকিবে। আত্মার পৌরুষ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইবে, প্রকৃতির সুখশ্রীও ক্রমশ পরিপুষ্ট ও উৎকৃষ্ট হইতে থাকিবে। লোকান্তর-সকল জীব-পুঞ্জে দিন দিন পরিপূর্ণ হইবে। আমরা নব নব লোকে ঈশ্বরের নব নব মহিমা অনুভব করিতে থাকিব! ভোগের অন্ত নাই, দৃশ্যের সীমা নাই, ভোক্তার বিনাশ নাই; দ্রষ্টার বিশ্রাম নাই; কার্য্য অশেষ, কর্ত্তা চিরায়ুঃ, পথ অসীম, পথিক অক্লান্ত। ভয় নাই, মৃত্যু নাই, নৈরাশ্যের কারণ নাই; সংসার চিরস্থায়ী, তুমি চিরজীবী। ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর— তিনি মঙ্গলময় পিতা, আমরা চিরজীবী সন্তান, জগৎ অক্ষয় গৃহ।

থিওডোর পার্কর।

২৮৩ সংখ্যক পত্রিকার ২৬২ পৃষ্ঠার পর।

কেহ কেহ কহেন যে, মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় একেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। যখন মনুষ্যজাতির স্বাভাবিক আছে এবং মনুষ্যের ঈশ্বর-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, তখন এই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইতিহাস ইহার অন্যথা প্রতিপাদন করিতেছে। ইতিহাস-পাঠে ইহা সুস্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, অধিকাংশ লোক জড়োপাসনা ও বহুদেব দেবীর উপাসনা অবলম্বন করিয়া আছে। বর্ত্তমানের কথা দূরে থাকুক, অতি প্রাচীন কালেই ধর্ম্মের হীনাবস্থা প্রত্যক্ষ হয়। সুপ্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত-লেখক মহাত্মা হিরোডোটস্ যে সমস্ত অসভ্য জাতির বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারদিগের কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক সকল প্রকার অবস্থা এক্ষণকার অসভ্যদিগের অবস্থা অপেক্ষা যৎসামান্য ছিল। পূর্ব্বে যে সমস্ত জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহারদের আদি অবস্থা যত অনুসন্ধান করা যায়, নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজের দশা ততই নীরস বোধ হইয়া থাকে। এই সকল ও অন্যান্য জাতি সর্ব্বাগ্রে জড়োপাসক ছিল। ফলত ঐতিহাসিক প্রমাণ দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই বোধ হয় যে, কোন জাতিই আদি অবস্থায় প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। সুতরাং আদি কালে সত্যযুগের কল্পনা নিতান্ত অমূলক বলিয়াই বোধ হয়।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যেমন সাধারণ, পরকালে বিশ্বাসও সেই রূপ। কি অসভ্য

কি সভ্য সকল জাতির মধ্যেই এই এই বিশ্বাসের ভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের যত প্রকার-ভেদ আছে, কোন স্থলেই ইহা বিস্মৃত হয় নাই। এক্ষণে ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মনুষ্যের স্বাভাবিক যে এক অনন্ত ইচ্ছা ও অমরত্বের ভাব আছে, তাহার প্রভাবেই এই নৈসর্গিক বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে। সভ্য জাতির তো কথাই নাই, যে সমস্ত জাতি নিতান্ত অসভ্য, যাহাদিগের সহজ জ্ঞানই একান্ত প্রবল, আমরা তাহারদিগের মধ্যে এই স্বাভাবিক বিশ্বাস বিদ্যমান দেখি। উহারা কল্পনা বলে এমন একটি স্থান প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে, যথায় মৃত মনুষ্যের আত্মা আহূত হইয়া পার্থিব অন্যায় ব্যবহারের নিমিত্ত দণ্ড ও সৎ কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃত পুরস্কার লাভ করে। এই পরলোকের বিশ্বাস সাধারণেরই যে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে জাতির যেরূপ স্বভাব ও অবস্থা তদনুসারে সে পরলোকের ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছে। কোন কোন জাতি লোকান্তরকে সংগ্রাম-স্থান, কেহ কেহ শান্তি-স্থান, কেহ কেহ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি উপভোগের স্থান, কেহ কেহ আধ্যাত্মিক বৃত্তি চরিতার্থ করিবার স্থান, কেহ কেহ পরিবর্ত্তের স্থান, কেহ কেহ উন্নতির স্থান বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। যে জাতি লোকান্তরগত যে রূপ ব্যবস্থা স্থাপন করে, তদ্দ্বারা তাহার ঐহিক জীবনের অবস্থা সম্পূর্ণ অবগত হওয়া যায়। এই লোকান্তরগত ব্যবস্থা বিষয়ে পৌত্তলিক খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী। যাহাই হউক মনুষ্যের পরলোকের ভাব যে যথার্থ, ইহাতে আর সংশয় নাই; কিন্তু পরলোকের অবস্থাগত নির্ণীত ভাব সমুদায় কেবল বিশ্বাস-নিষ্ঠ, সুতরাং উহার যাথার্থ্যের পক্ষে সন্দেহ উপস্থিত হইবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা। মনুষ্যের অসভ্যাবস্থা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারদিগের ঐ অবস্থায় ধর্ম্মের ন্যায় পরলোকের মতও নিতান্ত অসংস্কৃত ছিল।

অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি যার পর নাই নিস্তেজ হইয়া থাকে। যখন সভ্যতার ক্রমশ উন্মেষ হয়, তখন তাহারা পরকালের প্রমাণ অনুসন্ধান করে। ঐ অবস্থায় পরকালের স্বতোত্থিত ভাব উহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না এবং ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব যে প্রত্যেক মনুষ্যের শুভ সাধনে উদ্যত আছে, উহারা তাহাও সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকে। সুতরাং পরকাল-বিষয়ে উহারদিগের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হয়। সহজজ্ঞানের সহিত বুদ্ধির বিরোধ জন্মে এবং বুদ্ধি এককালে সহজ জ্ঞানের পরিপন্থী হইয়া উঠে। কিন্তু যখন কোন একটি ঘটনা-সূত্র উহাদিগের মনে এমন একটি ভাব উদ্বোধিত করিয়া দেয়, যাহা তর্কশাস্ত্র-প্রতিপাদিত সত্য ভাব অপেক্ষাও সার, তখন উহারদের পরকালের প্রতি নৈসর্গিক বিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠে। এক্ষণে পরলোক-বিষয়ে স্বতন্ত্র তিনটি বিষয় উপলব্ধ হইতেছে; প্রথম, পরকালে বিশ্বাস; দ্বিতীয়, পরকালের নির্ণীত অবস্থা; তৃতীয়, পরকালের প্রমাণ। প্রমাণ ও অবস্থা প্রকৃত নাই হউক, কিন্তু বিশ্বাস যে ধ্রুবপনেয় তাহাতে আর কোন সংশয়ই নাই।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, পেটিয়ার্কেরাও পরলোকের বিষয় সুস্পষ্ট বুঝিয়াছিল, কেহ কেহ কহেন যে প্রাচীন বাইবেলে ইহার উল্লেখও নাই। যাহাই হউক এই দুই কথাই অযৌক্তিক। হিব্রুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কোন অংশে পরলোক-

বিষয়ে কত গুলি অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক অভিপ্রায় আছে বটে, কিন্তু উহাতে পরলোকের উপর একটি দৃঢ় বিশ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায় এবং কোন কোন অংশে পরলোকের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চিহ্নও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে যে যে অংশ অগ্রে প্রস্তুত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ে পরলোক যে মনুষ্যের একান্ত প্রয়োজনীয় ইহার কিছুমাত্র আভাস নাই; নিয়ম পুস্তক ইহার কিছুই নির্ণয় করিয়া যায় নাই এবং ইহুদিদিগের উপাসনা প্রণালীতেও ইহার কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহারা কখন দেহের শোণিতকে, কখন নিশ্বাসকে এবং কোন স্থলে রক্তাশয় ও কোন স্থলে অন্ত্রকে আত্মার আশ্রয় স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। যাহাই হউক পরলোকের ভাব এই সমস্ত পুস্তকে নিতান্ত অস্পষ্ট রহিয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগের অবস্থা নিতান্ত তমোময় ও নিরানন্দময় বলিয়া উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। পরলোকে ভৃত্য প্রভুর সহিত সম্পর্ক শূন্য এবং প্রভুরও মহিমার ছায়া মাত্র অবশিষ্ট থাকে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আরও দেখা যায় যে, মৃত মহাপুরুষেরা জীবিত ব্যক্তির শিক্ষা বিধানের নিমিত্ত পুনরায় আহূত হইতে পারেন। ইনক ও ইলিজা ঈশ্বরের অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন। এই নিমিত্ত উহাঁরদিগকে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই উহারদিগকে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত করেন। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্ম পুস্তক সংক্রান্ত অন্যান্য অংশ পরলোকের বিষয় এক কালে অস্বীকার করিয়াছে।

ইহুদিদিগের নির্ব্বাসন স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর পরলোকের মত অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট হইয়াছিল। ইজেকিএল মৃত্যুর পর দেহের পুনরুত্থানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই মতটি বোধ হয়, জোরোষ্টার অপেক্ষা প্রাচীন। সোলোমনের জ্ঞান নামক পুস্তক এবং মাকাবির চতুর্থ পুস্তকে এই মত বিশদ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মাকাবির দ্বিতীয় পুস্তকে মৃত্যুর পর মনুষ্য মাত্রেরই পুনরুত্থানের বিষয় দৃষ্ট হয় এবং উহাতে আরও কহে যে, ধার্ম্মিকেরা লোকান্তরে সুখ ও নিষ্ঠুর লোকেরা লজ্জা প্রাপ্ত হইবে। তথায় সকলেই পূর্ব্ব-পরিচিত পার্থিব বন্ধুগণকে দেখিতে পাইবে এবং চিরাবলম্বিত ব্যবসায় গ্রহণ করিবে।

খ্রিষ্টের সময় ফারিসিসেরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, পুণ্যের নিমিত্ত পুরস্কার ও পাপের নিমিত্ত দণ্ড স্বীকার করিত। ইহারদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জ্জন্ম ও এই জন্মের পূর্ব্বে জন্মান্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। ইসেনেস মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করিয়া আত্মার অমরত্ব ও পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের বিষয়ে বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে আত্মা সূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ। উহা দেহরূপ কারাগারে বদ্ধ হইয়া আছে। মৃত্যু উহাকে এই বদ্ধভাব হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। তখন এই জীবিত আত্মা আনন্দিত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। আমরা মহাত্মা ফিলোর আত্মার বিষয়ে এই রূপ অভিপ্রায় দেখিতে পাই। বোধ হয়, খ্রিষ্টের সময় যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করিত, তাহারদিগের প্রত্যেকেরই চিন্তাশীল মনে এই সমস্ত ভাব উদিত হইয়াছিল। কিন্তু সাদ্ধুসিস্ এই মতে আস্থা প্রদর্শন করেন নাই।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এই বিশ্বাসের ভাবটি সাধারণ। ইহারদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রণালী ও মৃত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত প্রার্থনা আলোচনা করিলে ইহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হয়। আমেরিকার অসভ্যেরা মৃত

যোদ্ধাগণের ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদ সমাধিক্ষেত্রে উহাদিগের সহিত নিখাত করিয়া রাখে। সৌদিয়, গথ, আমেরিকান ও অর্দ্ধ সভ্য গ্রীকেরা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে তাঁহার সহিত তাঁহার অশ্ব বা ভৃত্য, স্ত্রী বা বন্দীকে ভূগর্ভে নিখাত বা চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিত। ইহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, মৃত ব্যক্তির সহিত অশ্বাদি নিখাত করিলে মৃত ব্যক্তিরা লোকান্তরে সসম্ভ্রমে গমন করিতে পারিবেন। পুনর্জ্জন্ম, মৃত ব্যক্তির দেবত্ব প্রাপ্তি, উহার সম্মানার্থ নানা প্রকার অনুষ্ঠান, সমাধি-কালে বিবিধ দ্রব্য প্রদান, এই সমুদায়ই পরলোকের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের চিহ্ন। ইজিপ্টিয়, গল্ ও স্কান্দিনেভিয়েরা মৃত্যুকে জীবনের একটি আবশ্যক ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। লুকান নামক এক ব্যক্তি কহিয়াছেন যে, স্কান্দিনেভিয়েরা যখন আত্মার অনন্ত কাল অবস্থিতির বিষয় বিশ্বাস করে, তখন উহারা অতিশয় সাহসী সন্দেহ নাই।

প্রায় সকল অসভ্য জাতিই মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। তাহাদিগের মত এই যে, মৃত্যু হইলে এক কালে সমুদায় নির্ব্বাণ হয় না, প্রত্যুত উহা একটি জীবনের পরিবর্ত্ত বিশেষ। উহারা কহে যে স্বর্গ পৃথিবীর ন্যায়। পৃথিবীতে যে সমস্ত অভাব আছে, স্বর্গে তাহার কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না। ফলত উহারা পৃথিবীকে ভূষিত করিয়া স্বর্গ রূপে দর্শন করিয়া থাকে। প্রথমত উহাদের এই রূপ ভাব ছিল যে পরলোক দণ্ড পুরস্কারের স্থান নহে। ঐ স্থানে ঈশ্বরের বিচার-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নাই। কিন্তু সময় যত অতীত হইতেছে, ততই উহাদিগের পরলোক বিষয়ে অভিপ্রায় বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতেছে। পনি জাতীয়েরা মৃত ব্যক্তিদিগের স্থান একটি, স্কান্দিনেভিয়েরা দুইটি, পারসীকেরা সাতটি এবং হিন্দুরা চব্বিশটি কল্পনা করিয়া থাকে।

সংস্কৃত সাহিত্য।

১৮২ সংখ্যক পত্রিকার ২১১ পৃষ্ঠার পর।

বৈদিক গ্রন্থ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে তাহা হইতে এমন কত গুলি লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তাহার সাহায্যে বৈদিক কালের গ্রন্থ ও বৈদিক কালের পর যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে,তাহা অনায়াসেই বিচার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে প্রত্যেক গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ নিগূঢ় লক্ষণ উদ্ধার করা তাদৃশ সহজ নহে; কিন্তু পাঠ মাত্রেই যে সমস্ত আমাদিগের বোধগম্য হয় এই উভয় কালগত গ্রন্থ-সমুদায়ের শ্রেণী-বিভাগ বিষয়ে তাহাই যথেষ্ট হইবে। বৈদিক কালের গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহাই দৃষ্ট হয় যে এক্ষণকার ব্যাকরণ অনুসারে যে সমস্ত পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে, বৈদিক গ্রন্থ কর্ত্তারা তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলেন। এই নিমিত্ত ব্যাকরণ-কারেরা বেদের এই রূপ নিরঙ্কুশ ব্যবহারকে বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই অসাধারণ লক্ষণ দ্বারা উভয় কালগত গ্রন্থ সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। মনু-প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কতক গুলি প্রাচীন বৈদিক রীতি অনুসৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বেদোক্ত সূক্ত শ্লোক রূপে পরিণত করিতে গিয়া কোন কোন স্থলে বৈদিক শব্দ ও বৈদিক প্রণালী স্বগ্রন্থ-মধ্যে অবিকল রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি যেরূপ ভাষার রীতি অবলম্বন করিয়াছেন,তাহার সহিত উহার সম্পূর্ণ বিসম্বাদিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি, বৈদিক

গ্রন্থে ঐ সকল শব্দ ও প্রণালীর যে একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে তাহার অনেক ব্যত্যয় হইয়াছে।

বৈদিক গ্রন্থে যে রূপ গদ্য আছে, বৈদিক কালের পরে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তৎসমুদায়ে ঐ রূপ গদ্যের অনুকরণ দেখা যায় না। গদ্যের ন্যায় পদ্যও উত্তর কালীন গ্রন্থের বিভেদ নির্দ্দেশের বিশেষ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কতক গুলি বৈদিক ছন্দ বৈদিক কালের পরেও অন্যান্য গ্রন্থে পরিগৃহীত হইয়াছে বটে কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থে এমন সকল ছন্দ আছে, যাহা বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহাও এই উত্তর কালীন গ্রন্থ সমূহের বিভেদ স্থানের একটি প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

এই ছন্দোগত বৈচিত্র্যই বৈদিক ও অবৈদিক গ্রন্থের স্বরূপ-গত বৈচিত্র্য সুস্পষ্টই প্রতিপাদন করিতেছে। ভারতবর্ষে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, ছন্দোগত বৈচিত্র্য যে কেবল তাহাদিগের মধ্যে ব্যবধান স্বরূপ হইয়া কাল বৈসম্য প্রদর্শন করিতেছে, তাহা নহে, অন্যান্য স্থানে অতি প্রাচীন কালীন অন্যান্য জাতির গ্রন্থের কালগত সীমার নির্ণয় করিতে হইলে ছন্দই বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। যদি এক জন কবি কোন এক ছন্দকে সাধারণের শ্রুতিসুখকর করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্যান্য কবিরাও তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে যত্নবান হন। ক্রমশ এই অভিনব ছন্দঃ-প্রিয়তা এত প্রবল হইয়া উঠে যে উহা প্রাচীন প্রথা এক কালে অতিক্রম করে এবং পূর্ব্বতন যে সমস্ত কবিতা এক সময়ে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ছিল, তাহা এক কালে বিস্মৃত করিয়া দেয়।

এক্ষণে ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক বৈদিক কালে সম্যক অপরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং ঐ সমস্ত অনুষ্টুপ শ্লোক-সঙ্কলিত গ্রন্থ যে বৈদিক সময়ের পরে প্রস্তুত হয়, তাহা উল্লেখ করা নিরর্থক। কেহ কেহ এইরূপ কহিতে পারেন যে বেদের সুক্ত মধ্যে এবং ব্রাহ্মণ ও সুত্রে অনুষ্টুপ ছন্দ আছে; সুত্র মধ্যে যে বিষয় গদ্য প্রণালী অনুসারে একবার উল্লিখিত হইয়াছে, সেই বিষয় অনুষ্টুপ ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে পুনরায় সংক্ষেপে বর্ণিত দৃষ্ট হয়। এই আপত্তি তাদৃশ বলীয়ান বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ এক সময়ে এই ছন্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এমন কি এই ছন্দ যখন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন ইহাতে বহুসংখ্য পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে ইহার সদ্ভাব আছে বটে কিন্তু পুরাণাদির ন্যায় অবিরল নহে। সুতরাং এই অনুষ্টুপ ছন্দই সংস্কৃত সাহিত্যের সময়-বিভাগ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ স্থল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

যে সমস্ত গ্রন্থ কেবল অনুষ্টুপ শ্লোকে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বৈদিক সময়ের নহে। সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ ও অন্যান্য দর্শন বৈদিক সময়ের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এক্ষণে কোন্ গ্রন্থ বৈদিক কালের তাহা নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

বৈদিক কালের মধ্যেও চারিটি কল্প উপস্থিত হইয়া ছিল। প্রথম ছন্দঃ কল্প, দ্বিতীয় মন্ত্র কল্প, তৃতীয় ব্রাহ্মণ কল্প, চতুর্থ সুত্র কল্প। এই চারিটি কল্পের যে ক্রম বিভাগ আছে, তাহা অনায়াসেই সপ্রমাণ হয়। যদি সুত্র কল্পের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহার পূর্ব্বে

ব্রাহ্মণ কল্পের অস্তিত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এই রূপ চারি কল্পেরই অনুক্রম সুস্পষ্টই অনুভূত হয়।

সূত্র কল্প বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই প্রকার গ্রন্থের মধ্যে একটি যোগ বিধান করিয়া দিতেছে; সুতরাং ইহা সাহিত্য সংক্রান্ত ইতিহাসের বিশেষ উপযোগী। এমন কতকগুলি গ্রন্থ দৃষ্ট হয় যে যদিও ঐ সকল গ্রন্থ নিরবচ্ছিন্ন অনুষ্টুপ ত্রিষ্টুপ্ ও অন্যান্য ছন্দে রচিত হইয়াছে, যদিও পরবর্ত্তী অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত ঐ সকল গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে, তথাচ তৎ সমুদায়কে সূত্র কল্পের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে *।

যাঁহারা সূত্র কল্পের গ্রন্থ পর্য্যালোচনা না করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উহার রীতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া নিতান্ত সুকঠিন। যে সমস্ত গ্রন্থ এই কল্পে লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় কেবল অনতিদীর্ঘ সূত্র পরিপূর্ণ। ঐ সকল সূত্র সংক্ষিপ্ত ভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। সংক্ষিপ্ত রচনাই এই সকল গ্রন্থের বিশেষ রীতি। ব্যাকরণ ছন্দ পদার্থ বিজ্ঞান প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের মত ইহাতে অভিব্যক্ত আছে, তৎ সমুদায় নিতান্ত অবিষদ। তাহাদের কঙ্কাল মাত্র ইহাতে অবশিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে কোন একটি পদ্ধতির বিশেষ স্থল গুলির সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে বটে কিন্তু এই সকল গ্রন্থে অভিপ্রায়-গত একটি সংযোগ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন সুবিখ্যাত পণ্ডিত কহিয়াছেন যে, সূত্রগ্রন্থ সমূহে রচনার জটিলতা নিবন্ধন অভিপ্রায়ের একটি সুস্পষ্ট বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। উহাতে নিষেধ, সঙ্কোচ ও পরিসংখ্যা, সাধারণ বিধি সমূহকে এত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, যে, তৎসমুদায়ের পরস্পর যোগ অবধারণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। এই সমস্ত সূত্রগ্রন্থে টীকার সাহায্য না লইলে ইহার তত্ত্ব কিছুই অভিব্যক্ত হয় না।

এই রূপ গ্রন্থ উত্তরোত্তর অনেক প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ভাবে যে কেবল মূল মত গুলি প্রকটিত আছে, তাহা নহে, গণিত বিদ্যার প্রণালী অনুসারে উহাতে এই রূপ এক নূতন সাঙ্কেতিক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে যে তাহাতে সমুদায় মতই পরিণত দেখা যায়। গণিত শাস্ত্রে ক, খ, গ, ইত্যাদি বর্ণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া না দিলে যেমন ঐ গুলি অসম্বদ্ধ বোধ হয়, ঐ সমস্ত গ্রন্থে অবিকল সেই রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দ সমূহ বোধ-সুলভ করিবার নিমিত্ত প্রতি সূত্রেরই টীকা আছে। উহার নাম পরিভাষা। এই সমস্ত পরিভাষা কণ্ঠস্থ না করিলে এই সকল গ্রন্থে এক পদও অগ্রসর হইতে পারা যায় না। আবার অনুবৃত্তি ও নিবৃত্তির নিয়ম না জানিলে প্রস্তুত বিষয়টির মর্ম্মগ্রহ করাও সুকঠিন হইয়া উঠে। প্রথমত সূত্রগ্রন্থ একটি অধিকার লইয়া আরব্ধ হয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না এই রূপ কোন এক নূতন বিষয় আইসে, ততক্ষণ ইহার উল্লেখ মাত্র থাকে না; ইহার মধ্যে প্রারব্ধ বিষয় বুঝিয়া লইতে হয়। গ্রন্থকার প্রস্তুত বিষয়ে বক্তব্য ব্যক্ত করিয়া একটি প্রথম নিয়ম স্থাপন করেন। এই নিয়ম পরবর্ত্তী যে নিয়ম প্রস্তুত বিষয়কে প্রপঞ্চিত বা সঙ্কুচিত করিতেছে, তাহার উপর বিশেষ শক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। আবার এই প্রপঞ্চক ও সঙ্কোচক নিয়ম সমুদায় অন্য নিয়মের উপর শক্তি প্রকাশ করে। এই রূপ একটি

* আতি সাঙ্খ্য, অনুক্রমণী ও পরিশিষ্ট।

নিয়মে আর একটি নিয়মের সংক্রমণকেই অনুবৃত্তি ও তাহার বিরামকেই নিবৃত্তি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই অনুবৃত্তি ও নিবৃত্তির নিয়ম না জানিলে সূত্র গ্রন্থ সহজে বোধগম্য হয় না। বিশেষত যে সূত্র গ্রন্থে মীমাংসা পূর্ব্ব-পক্ষ উত্তর পক্ষ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, অনুবৃত্তি ও নিবৃত্তি তাহা বুঝিবার বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এই স্থলে বিধি-পক্ষ ও নিষেধ-পক্ষের প্রসক্তি এত জটিল এবং একই গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই উভয় পক্ষ সমর্থনার্থ এই রূপ প্রগাঢ় যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে,যে পর্য্যন্ত না সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ততক্ষণ গ্রন্থকর্ত্তা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। ফলত এই রূপ রচনা অতিশয় বিস্ময়কর। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত গ্রন্থ ব্যতিরেকে প্রায় আর কোন গ্রন্থই এই রূপ দেখা যায় না।

মহর্ষিগণ বহুকাল অনুশীলন ও চিন্তা দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, এই সমস্ত সূত্র গ্রন্থে তাহার সারাংশ সঙ্কলিত আছে। এই সকল গ্রন্থ যদিও ব্যক্তি বিশেষের রচনা, তথাচ কেবল রীতি ব্যতিরেকে গ্রন্থ কারের নিকট উহা আর কোন বিষয়েই ঋণী নহে। ঐ রীতিও আবার জন-শ্রুতিতে উপনীত হইয়া আসিতে ছিল এবং উহা বহু ব্যক্তির প্রয়াসে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং সূত্র গ্রন্থে গ্রন্থ কর্ত্তার বিশেষ কোন গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ ও সূত্র কল্পের গ্রন্থ সমুদায়ের মধ্যে একটি বিভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থের রচনাগত তারতম্য আছে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা বেদে ব্যাকরণ দোষ যেমন বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন, সূত্রেও সেই রূপ *। রচনাগত বিভিন্নতা ব্যতিরেকে আর একটি বিশেষ ভেদও দৃষ্ট হয়। সূত্রের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্র কারেরা কহিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র গ্রন্থই শ্রুতি প্রসব করিতেছে। এই সমস্ত গ্রন্থ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থেরই শ্রুতি-প্রসবকারিতা নাই। যে সমস্ত গ্রন্থ শ্রুতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা মনুষ্য রচিত নহে। ঐ সমস্ত শ্রুতি স্বয়ং ঈশ্বর মনুষ্যে প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। সূত্র গ্রন্থ শ্রুতি-মূলক, এই নিমিত্ত উহা শ্রৌত সূত্র বলিয়া অভিহিত হয় এবং উহা শ্রুতি-মূলক হইলেও মনুষ্য-রচিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে স্থলে সূত্র শ্রুতি-বিরুদ্ধ আছে, তাহা অগ্রাহ্য এবং যথায় শ্রুতি-প্রমাণের অসম্ভাব প্রযুক্ত স্বতন্ত্র মত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও নিরপেক্ষ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

এক্ষণে সূত্র গ্রন্থ যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের পরে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার যদি আর কোন উপায়ই না থাকে, তথাচ উভয় বিধ গ্রন্থের এই বিভিন্নতা কাল্পনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন ভারতবর্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এই উভয় বিধ গ্রন্থের এই রূপ বিভেদ উহাতে যে পর্য্যন্ত শক্তি প্রকাশ করে, তাহা যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি এই বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। অনেকানেক গ্রন্থ এই বিষয়ে সবিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

* প্রাতি সাখ্য সূত্রে আছে 'তা বশং গমানি' এই স্থলে 'তানি বশংগমানি' হইবে। টীকাকার কহিয়াছেন যে, অত্র তানি শব্দ লোপো দ্রষ্টব্যঃ এই স্থলে তানি শব্দ বিলুপ্ত হইয়াছে। আপস্তম্ব সূত্রে আছে 'অধাসন শায়ী' এই স্থলে টীকাকার কহিয়াছেন যে অধঃশব্দস্য সবর্ণ দীর্ঘ শ্ছান্দসোঽপপাঠো বা। অধঃ-আসন এই উভয় পদ মিলিত হইয়া অধাসন হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বৈদিক প্রয়োগ বা অপপাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই রূপ অনেকানেক সূত্র গ্রন্থে ব্যাকরণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তত্ত্ববিদ্যা।

ভোগ কাণ্ড।

উপক্রমণিকা।

আমরা জ্ঞানেতে যে সকল সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকি, ভাবেতে সেই গুলি উপভোগ করিয়া পরিপাক করিতে পারিলে, তবে আমাদের ইচ্ছাতে কর্ম্ম-করিবার বল জন্মে; এই হেতু জ্ঞানকাণ্ডের পরে ভোগ কাণ্ডকেই অধিকার দেওয়া হইতেছে।

পূর্ব্ব খণ্ডে সংশয় হইতে প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হইবার সেতু সন্নিবেশিত হইয়াছে; এক্ষণে সেই সুরম্য প্রদেশে উপনীত হইয়া তথাকার ফল ভোগ করিবার যে রূপ পদ্ধতি, তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তত্ত্ব-সকল উপলব্ধি করা জ্ঞানের কার্য্য; ভাবের কার্য্য কি?—না, সেই গুলিকে আদর্শ রূপে বরণ করত তাহাতে জীবন সমর্পণ করা,—ইহারই নাম উপভোগ। এক্ষণে জ্ঞানের উপলব্ধি ব্যাপারকে আলোচনা ক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি দিয়া, তাহার স্থলে ভাবের এই উপভোগ ব্যাপারকে অভিষেক করা যাইতেছে। পূর্ব্বে জ্ঞানের মূল তত্ত্ব সকল লইয়া আন্দোলন করা হইয়াছে, এক্ষণে ভাবের মূল আদর্শ সকলের প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান বিষয় দুই রূপে অনুশীলিত হইতে পারে;—এক, ভাবকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উহাকে স্বতন্ত্র রূপে বিবেচনা করা; অপর, জ্ঞানের সহিত ভাবের পদে পদে যোগ রক্ষা করিয়া চলা। আমরা শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতেই ব্রতী হইয়াছি। কারণ, যদি আমরা এরূপ জানিতাম যে জ্ঞানের সহিত ভক্তির কোন সম্পর্ক নাই, তাহা হইলে অবশিষ্ট কেবল কুতূহল-নিবৃত্তি রূপ প্রলোভন কখনই আমাদিগকে সেই কঠোর জ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না; প্রত্যুত, ইহার পরে ভক্তিতে উত্তীর্ণ হইব, এই ভাবিয়াই আমরা সমুদায় জ্ঞান-পথ মনের সন্তোষে অতিবাহন করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্ব খণ্ডের প্রথমেই ইন্দ্রিয়-বোধ, বুদ্ধি, এবং প্রজ্ঞার মধ্যে এই রূপ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-বোধ অনুসরণ করিয়া আমরা বিষয় উপলব্ধি করি, বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া আমরা বিষয়ীকে উপলব্ধি করি, এবং প্রজ্ঞা অনুসরণ করিয়া আমরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করি। অতএব প্রজ্ঞা যে কেবল ইন্দ্রিয় বোধ হইতেই পৃথক্-স্বভাব এমন নহে, উহা বুদ্ধি হইতেও পৃথক্-স্বভাব; তাহার প্রমাণ এই যে মূল তত্ত্ব সকল কোন রূপেই আমাদের বুদ্ধিতে আইসে না, কিন্তু প্রজ্ঞাতে সে সকল নিশ্চয় রূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রজ্ঞার আদি এবং অন্ত সেই মূল সত্য, যাঁহার সুন্দর মঙ্গল ছটাতে আধ্যাত্মিক ভৌতিক সমুদায় জগৎ বাস্তবিক সত্য হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। বাস্তবিক সত্যের সেই যে ভাব, তাহা কি আমাদের বুদ্ধির সিদ্ধান্ত? আমরা কি আপনারা বুদ্ধি খাটাইয়া সত্য হইয়াছি—না বহির্জ্জগৎকে বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা সত্য করিয়াছি? অতএব আর সকলই যদি বুদ্ধি দ্বারা স্থির করা সাধ্য হয়, তথাপি আমি বাস্তবিক কি না, জগৎ বাস্তবিক কি না, ইহা স্থির করিতে গিয়া বুদ্ধির সমুদায় আড়ম্বর নিষ্ফল হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। মূল সত্যকে যিনি যত টুকু লাভ করেন, তাহা তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে কেবল মাত্র আত্ম-চেষ্টা দ্বারা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। এই হেতু মূল সত্যকে যখনই যিনি বুদ্ধির বশে আনয়ন করিতে গিয়াছেন, তখনই তিনি তাহার এই ফল পাইয়াছেন যে জাগ্রৎ জীবন্ত বাস্তবিক সত্যের পরিবর্ত্তে কোথাকার এক স্বপ্নবৎ নির্জ্জীব

কাল্পনিক সত্য সমাগত দেখিয়া সত্যের নামে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। কিন্তু সত্য-স্বরূপ যিনি, তিনি দূরে যান নাই, তিনি নিকটেই আছেন, আমরাই আপন বুদ্ধিমত্তায় অন্ধ হইয়া মনে করিতেছি যে আমরা তাঁহা হইতে দূরে আছি, আমাদের উপর তাঁহার চক্ষু নাই—তাঁহার হস্ত নাই। অতএব আমরা যদি পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করি, তবে তন্নিমিত্তে তাঁহারি নিকট প্রার্থনা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, নতুবা আমরা যদি আপন বলে তাঁহাকে উপযুক্ত রূপে জানিতে যাই, তবে অবশ্যই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিব, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখনকার জিজ্ঞাস্য এই যে মূল সত্য পরমাত্মা যখন আমাদের প্রজ্ঞাতে দেখা দেন, তখন আমাদের হৃদয়ে কি রূপ ভাবের উদ্রেক হয়? তখন একান্ত নির্ভরের ভাব আসিয়া আমাদের সমুদায় আত্মাকে অভিভূত করে; আমরা যে কি অকিঞ্চন, এবং পরমাত্মা যে কি মহান্, তখন তাহাই উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই রূপ একান্ত নির্ভরের ভাবকেই ভক্তি কহা যায়। প্রজ্ঞা-অবিদ্যমানে যেমন সকলই স্বপ্নবৎ অর্থশূন্য ভাবে পরিণত হয়, ভক্তি-অভাবে সেই রূপ সকলই শ্রী-হীন রূপে প্রতিভাত হয়। নিজে স্বপ্নবৎ হইলে সকলই স্বপ্নবৎ দেখায়, নিজে শ্রী-হীন হইলে সকলই শ্রী-হীন দেখায়;—সুতরাং আমরা যদি প্রজ্ঞা হইতে পারমার্থিক সত্য এবং ভক্তি হইতে পারমার্থিক শ্রী লইয়া আত্মসাৎ করিতে অবহেলা করি, তাহা হইলে আমরা নিজে অপদার্থ ও শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া সকলকেই যে সেই রূপ দেখিব ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

প্রজ্ঞা ও ভক্তি যখন পরমাত্মার দিকে উন্মুখ হয়, তখন আত্মার সেই যে ক্রিয়া তাহা অত্যন্ত অন্তর্মুখীন হইয়া থাকে, হস্ত পদ পরিচালনার ন্যায়, বা বিষয় চিন্তার ন্যায়, বহির্মুখীন নহে। পূজার্হ মনুষ্য বিশেষকে আমরা জোড় করে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করি, কিন্তু আত্মা মস্তকও নত করে না, করদ্বয়ও সম্মিলিত করে না, অথচ যার পর নাই অকৃত্রিম ভক্তিভাবে পরমাত্মাকে প্রণাম করিয়া থাকে; আত্মার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমাদের শরীরও নত হয়, হস্তও কৃতাঞ্জলিপুটে আবদ্ধ হয়, নেত্রও সজল হয়, এ সকলই হয় বটে, কিন্তু এ সকল বিনা আয়াসে আপনা আপনি হয়, আত্মাকে এ সকল লইয়া ব্যস্ত হইতে হয় না; কেন না আত্মা বিনা-নেত্রে পরমাত্মাকে দর্শন করিতেছে, বিনা-শ্রবণে তাঁহার আদেশ শুনিতেছে, বিনা-বাক্যে তাঁহার স্তুতি গান করিতেছে, বিনা-শরীরে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিতেছে, আত্মা কোন সহায় সম্পত্তি ও আড়ম্বর ব্যতিরেকেও পরমাত্মার সহবাসে নিমগ্ন হইয়া, পরম আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া, অনন্ত জীবনের মত কৃতার্থ হইতেছে। পরমাত্মার সেই বিষয়াতীত অপরিমিত সৌন্দর্য্য, যাহা ভক্তি-রভসে আমারদের হৃদয়ের মূল শুদ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহার জ্যোতিতে যখন আমরা জগৎ সংসার নিরীক্ষণ করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় প্রেমরস আবির্ভূত হয়;—সকলেই আমরা একই পরমেশ্বরের সৃষ্ট, সকলেই আমরা একই জগতে, একই রাজ্যে, একই নিয়মের অধীনে বাস করিতেছি, সকলেই আমরা একই পরিবারস্থিত, কেহই আমাদের পর নহে,—এই এক অনিবার্য্য প্রেমানল সমুদায় জগৎকে একাকার করিয়াও তাহাতে ক্ষান্ত হয় না; কেন না পরমাত্মার প্রসাদ রূপ অক্ষয় ইন্ধনের সহিত তাহা এমনি যুক্ত রহিয়াছে যে কিছুতেই তাহার আশা,

আনন্দ এবং উৎসাহের পর্য্যাপ্তি হয় না। পরমাত্মা হইতে প্রাপ্ত তাঁহার প্রসাদ-চিহ্ন স্বরূপ—আমাদের আত্মাতে আমরা যতটুকু সৌন্দর্য্য ধারণ করি, তাহাই আমাদের নিকট—বাহিরের যাবতীয় পদার্থের সৌন্দর্য্য নিরূপণের আদর্শ স্বরূপ হয়; এবং এই আদর্শকে আমরা যে পরিমাণে বাহিরে প্রয়োগ করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের প্রেম চরিতার্থ হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন আমরা জগৎকে নিরীক্ষণ করি, তখন তাহা ভক্তির দেবালয় তুল্য দিব্য শোভা ধারণ করে; কিন্তু যখন উহাকে আমরা আমাদের নিজের সম্বন্ধে নিরীক্ষণ করি, তখন তাহা প্রেমের ক্রীড়া-কানন রূপে পরিণত হয়; কেন না,—জগৎকে যত আমরা আমাদের নিজের মনের মত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, ততই আমাদের প্রেম চরিতার্থ হয়; কিন্তু সেরূপ করিতে গিয়া আমরা যখন দেখি যে জগতের সৌন্দর্য্য কেবল আমাদের নিজের মনোনুরূপ নহে—পরন্তু আর এক অচিন্ত্য প্রকার, যখন দেখি যে আমাদের স্বল্প প্রেম তাহার নিকট পরাভব পাইয়া ফিরিয়া আইসে, যখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে ইহার মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সংভুক্ত রহিয়াছে অথচ তাহা ধরিতে গিয়া আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, তখন—সেই যে এক ভূমা ভাব তাহাতে আমাদের প্রেম আপাততঃ ক্ষুব্ধ হইলেও আমাদের ভক্তি তাহার দিকে প্রসারিত হইয়া অনুপম আনন্দ উপভোগে কৃতার্থ হইতে পারে।

প্রজ্ঞা হইতে এক পদবী নিম্নে বুদ্ধি, এবং তাহা হইতে আর এক পদবী নিম্নে ইন্দ্রিয়বোধ অবস্থিতি করে। বুদ্ধি কি? না, আপনাকে জানিয়া বিষয় সকলকে জানা—সাধারণ জ্ঞান শক্তিকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানে পরিণত করা, ইহাকেই বুদ্ধি কহে। ইন্দ্রিয়বোধ কি? না, যে অজ্ঞশক্তি দ্বারা বিষয় আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি বা জ্ঞানশক্তিকে প্রতিরোধ করে, তাহাই ইন্দ্রিয় বোধ শব্দে আখ্যাত হয়। বুদ্ধি জ্ঞানবান্ আত্মা হইতে অজ্ঞান বিষয়ে অবতীর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়-বোধ অজ্ঞান বিষয় হইতে জ্ঞানবান্ আত্মার অভিমুখীন হয়;—ইন্দ্রিয়-বোধ এবং বুদ্ধি, শরীর এবং আত্মা, পরস্পরের মধ্যে এই রূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আত্মজ্ঞান অনুসারে অন্যকে জানাতে যেমন বুদ্ধি প্রকাশ পায়, সেই রূপ আত্মভাব অনুসারে অন্যের ভাব উপভোগ করাতে প্রীতি প্রকাশ পায়, কারণ বাহিরের সামগ্রী বিশেষে যত ক্ষণ না আমরা আমাদের মনের অনুরূপ কোন এক আদর্শ আরোপ করিতে পারি, তত ক্ষণ আমরা তাহার সৌন্দর্য্য গ্রহণে বঞ্চিত থাকি। আমরা যখন একটা পুষ্পের পত্রপরিচ্ছদ গুলির সুবিন্যাস দর্শনে প্রীতি লাভ করি, তখন, আমাদের মনোমধ্যে যে এক সামঞ্জস্য ও পারিপাট্য ভাবের আদর্শ আছে, তদনুসারে আমরা সেই পুষ্পের অবয়ব গুলিকে অগ্রে কল্পনা করি, পরে উহাদিগকে ঐ সাধারণ আদর্শের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত রূপে অনুভব করিয়া, এই রূপে আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মুর্ত্তিমান্ করিয়া, কাজে কাজেই আনন্দিত হই। বিশেষতঃ মনুষ্যের শরীরে, মনুষ্যের কথা বার্ত্তাতে, মনুষ্যের ভাব ভক্তিতে, আমাদের নিজের মনের ঐ প্রকার অনেক গুলি আদর্শ আমরা সহজে ফলাইতে পারি বলিয়া, মনুষ্যকে আমরা যেমন প্রীতি করি, জগতের মধ্যে এমন আর কাহাকেও নহে।

ইন্দ্রিয়-বোধ উপলক্ষে পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, দেশে অবস্থান ও কালে

পরিবর্ত্তন, অবস্থা ও পরিবর্ত্তন, এই দুয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ স্ফূর্ত্তি পায়। বুদ্ধি কি করে?—না, সেই অবস্থা পরিবর্ত্তনের মধ্যে কতকটা বহির্ব্বিষয়ের শক্তি এবং কতকটা আমাদের আপনাদের শক্তি উপলব্ধি করিয়া আত্মানাত্ম-জ্ঞানের কলিকা উন্মোচিত করে। মনে কর, আমরা একান্ত অনন্যমনা হইয়া কোন একটা গুরুতর বিষয় ভাবিতেছি, ইতি-মধ্যে সহসা একটা উন্মুক্ত লিপি আমাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নিপতিত হইল; ইহাতে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র, কিন্তু সে ঘটনার প্রতি আমাদের বুদ্ধির একটুকুও মনোযোগ হইল না। সুতরাং সেই লিপি কিংবা তাহার অন্তর্গত লিখন-ছটা, কিংবা অক্ষরাবলির ভেদাভেদ, তখন ইহার কিছুই আমাদের জ্ঞান-গোচর হইল না। ইতি-পূর্ব্বে আমাদের দৃষ্টি হয় ত ধূসর বর্ণ মৃত্তিকার উপরে নিহিত ছিল, এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরাবলি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। এই প্রকারে, অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র ইন্দ্রিয়-বোধে প্রথমে সমানীত হয়, পরিশেষে বুদ্ধি আপন অন্তর-স্থিত আদর্শ অনুসারে তাহার অর্থ আবিষ্কার করিয়া তাহাকে জ্ঞানে পরিণত করে;—যেমন, শিক্ষিত আদর্শ অনুসারে আমরা ঐ লিপিটির অক্ষর সকলের, পদ সকলের ও পরিচ্ছেদ সকলের ভেদাভেদ নিরূপণ করিয়া, তবে আমরা তাহাকে জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই।

আমাদের দেহাদির যে রূপ অবস্থা যে রূপ পরিবর্ত্তনের দিকে উন্মুখ থাকে, সেইটি সংঘটিত হইলেই ইন্দ্রিয়-সুখ আবির্ভূত হয়;—যেমন, আমাদের প্রজ্বলিত জঠরানল যখন অন্ন ভোজনের দিকে উন্মুখ থাকে, তখন অন্ন ভোজন করিলেই আমরা সুখী হই। যে সুরের পর যে সুর, বা নিস্তব্ধতার পর যে সুর, শ্রবণে ভাল লাগে; যে বর্ণের পর যে বর্ণ, বা অন্ধকারের পর যে বর্ণ, নয়নে ভাল লাগে; যে রসের পর যে রস রসনাতে ভাল লাগে; সেই রূপে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলেই ইন্দ্রিয়-সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। ভিতরে যে আমাদের প্রাণ-ক্রিয়া সকল চলিতেছে, তাহাও, যার পর যে-টি সেই ভাবে চলিলে, তবেই আমরা শারীরিক ভাল থাকি, তাহার ব্যাঘাত হইলেই রোগে আক্রান্ত হই। এই প্রকারে আমরা যখন ইন্দ্রিয়-সুখে সুখী হই, তখন তাহা আমাদের আপনার নিয়মে হই না, ভৌতিক নিয়মেই হইয়া থাকি;—বাহিরে কোথায় কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদ্দ্বারা আমরা সুখে দুঃখে নিয়মিত হই। যত ক্ষণ না আমাদের অন্তরে একৃষ্ট রূপে জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তত ক্ষণ অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমরাও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকি;—না আমাদের আপনার উপর, না সেই পরিবর্ত্তনের উপর, আমাদের কোন হস্ত থাকে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপর নিয়ন্তৃত্ব করিয়া আমরা যে সুখ লাভ করি, সে এক প্রকার সুখ, এবং সেই পরিবর্ত্তনের দিকে হালি ছাড়িয়া দিয়া যে এক সুখ লাভ করি, সে এক প্রকার সুখ, পূর্ব্বোক্ত সুখ আমাদের সঙ্গের সঙ্গী, শেষোক্ত সুখ পথের সম্বল মাত্র—আনুষঙ্গিক উপকরণ মাত্র।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

গাওরে জগপতি জগবন্দন।
ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক।
কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল দাতা।
বিদ্যা সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা।
যাচে চরণ-ভক্ত করযোড়ে।
বিতর প্রেম সুধা চিত্ত-চকোরে।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ।

গত পৌষ মাসের নবম দিবসে বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের গৃহ-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। তদুপলক্ষে প্রধান আচার্য্য মহাশয় তথায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস প্রাতঃকালে ভাবী গৃহের নিকটে একটি প্রশস্ত স্থানে ব্রহ্মোপাসনার স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণের আহ্বান ক্রমে অনেক ভদ্র লোক তথায় আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে স্বাধ্যায়ান্ত ব্রহ্মোপাসনা ও তাৎপর্য্যের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কএকটি শ্লোক পাঠ সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদী হইতে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন—

হে মঙ্গলময় পরম পিতা! তুমিই সকল মঙ্গলের উৎস, তোমার মঙ্গল-ভাবে এ জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে। তুমি আমারদিগের পরমারাধ্য দেবতা, তোমার উপাসনাই আমারদিগের জীবনের লক্ষ্য। হে জীবনের জীবন! তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া যাহা কিছু সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি, তাহাই পবিত্রতা এবং সাধুভাবে পরিপূর্ণ। আমরা অদ্য যে মহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেছি, যদি তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তোমাকে স্মরণ না করি, যদি তন্মধ্যে তুমিই কেবল আমাদের একমাত্র লক্ষ্য না হও, তাহা হইলে আমাদের আয়াস ও পরিশ্রম সকলই অকর্ম্মণ্য এবং লক্ষ্য-বিহীন হইয়া পড়ে—এখানে ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির বলিয়া যে গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাও জীবন-শূন্য শরীরের ন্যায় বৃথা হইয়া যায়। অতএব হে নাথ! এই মহদ্ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার প্রারম্ভে তোমার নিকটে এই প্রার্থনা, যেন সকল বিষয়েই তুমি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থাক, কোন প্রকার মলিন পঙ্কিল চিন্তা যেন আমারদিগের নিকট হইতে তোমাকে প্রচ্ছন্ন না রাখে এবং কোন প্রকার অপবিত্র ভাব যেন আমারদিগকে তোমা হইতে দূরস্থ না করে। হে নাথ! তোমার অনন্ত করুণা-রাশি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মানবাত্মাতে যে সত্যের জ্যোতিঃ নিহিত রাখিয়াছে এবং তোমার অপার মহিমা উপলব্ধি করিবার যে জ্ঞান-বীজ আমারদিগের মাতৃ-ভূমিতে সর্ব্বাগ্রে বপন করিয়াছে; এই ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির তাহার একটি মহান্ ফল। যেমন এক ফল হইতেই ক্রমে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, কৃপানিধান! এই ভিক্ষা দেও, যেন এই ফলটিও ক্রমে সেই রূপ বহুতর বৃক্ষ উৎপাদন করে, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া মানব-মণ্ডলীর শ্রান্ত পাপ-তাপ-তাপিত আত্মাকে বিমল ছায়া দ্বারা শান্ত সুশীতল করে। আমরা যেমন সকলেই তোমার পুত্র, সেই প্রকার যেন একমাত্র অভেদ্য ধর্ম্ম-গ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ হইয়া এক পরিবারের ন্যায় তোমার আরাধনা-রূপ অমৃতময় ফলের স্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিষ্ঠ হইয়া মৃত্যুকে জয় করত তোমার অমৃত নিকেতনের অধিবাসী হইবার যোগ্য হই। হে স্বপ্রকাশ! তুমি আপন স্বরূপ আমারদিগের নিকট প্রকাশ কর, যাহাতে এই সত্য আমারদিগের মনে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত থাকে যে তোমাকে লাভ করাই আমারদিগের জীবনের পরম উদ্দেশ্য। নাথ! তোমার মঙ্গল ভাবে আমাদের আত্মাকে পরিপূর্ণ করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ হইতে সকল প্রকার বিদ্বেষ ভাব দূর কর, তোমার সকল সন্তানকে এক ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ করিয়া কেবল তোমার দিকেই লইয়া যাও, এবং নিয়ত তোমার প্রসন্ন মুখ-শ্রী প্রদর্শন করিয়া বিমলানন্দ ভোগের অধিকারী কর। দীন-নাথ! আমাদের উপর তোমার যে অপার প্রেম বিরাজ করিতেছে, তাহা যেন আমারদের সকল প্রীতিকে তোমাতেই একত্রীভূত করে এবং এই সমাজ-মন্দির যেন এতদঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাক্ষ্য দান ও চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সনাতন সত্য-সকল বিকীর্ণ করে। হে মঙ্গলময় সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা! আমার এই প্রার্থনা সিদ্ধ কর যেন আমাদের প্রত্যেক আত্মা তোমার মঙ্গল ভাবে পরিপূরিত হইয়া তোমার প্রতিষ্ঠা এবং অর্চ্চনার জন্য এক এক মন্দিরস্বরূপ হয়। হে নাথ! মানবাত্মাই তোমার প্রকৃত মন্দির, তাহা যেন দিন দিন কেবল তোমারই মঙ্গল ভাবে উন্নত হইয়া সমু-

সকল বাধা ও বিঘ্নকে অতিক্রম করত অনৈক্যের মূলোৎপাটন করিয়া অনন্ত কালে কেবল তোমারি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। আমরা সকলে যেন এই নূতন মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া তোমার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-সকল কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হই; এবং মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ও দুর্ম্মতি হইতে বিরত থাকিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্ম পালনে যত্নশীল হই এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা ও পরম মঙ্গলস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহ যুক্ত হই, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহ-বাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদী হইতে এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

আমরা অদ্য এই শুভ ক্ষণে মুক্ত সূর্য্য-কিরণে মুক্ত বায়ুতে বসিয়া শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের আরাধনাতে যে আনন্দ উপভোগ করিতেছি, এ আনন্দের আকর কোথায়? এই আনন্দের আকর সেই আনন্দ-স্বরূপ, যিনি সকল ভুবনের আলো। সূর্য্য-কিরণ সৌর জগৎকে আলো করে, কিন্তু তিনি সকল ভুবনের আলো। আমরা সেই স্ব-প্রকাশ আনন্দ-স্বরূপের আনন্দ আভা এই শুভ ক্ষণে উপভোগ করিতেছি, সব সুহৃদে মিলে সেই সখার নাম উচ্চারণ করিতেছি। আমারদের অদ্য এখানে সম্মিলনের কি প্রয়োজন? আমরা আমারদের জীবনের কোন্ লক্ষ্য সাধনের নিমিত্তে এখানে একত্রিত হইয়াছি? আমারদের আত্মার যে একটি মহত্তর গম্ভীরতর স্বর্গীয় ভাব, সেই ভাবকে সার্থক করিবার জন্যই আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। আমরা শরীর পোষণের জন্য অন্ন-পান আহরণ করি, রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চিকিৎসককে অবলম্বন করি; কিন্তু আমারদের আত্মার পাপ-মলিনতা কে অপনয়ন করিতে পারে? মনুষ্যের সাহায্যে হয় তো সাংঘাতিক রোগ হইতে, ঘোর বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে পারি; কিন্তু পাপের পরিত্রাতা কোথায়? আত্মা মলিন হইলে কে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারে? এজন্য ঈশ্বর আমাদের একমাত্র অবলম্বন—ঈশ্বরের অমৃত সলিলে সেই মলিনতার পরিহার হয়। আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি এবং তাঁর নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি যে যেন এই স্থানে তাঁহার মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তাহা চিরস্থায়ী হয়—যেন সাধু অসাধু সকলে এখানে আসিয়া তাঁহার মঙ্গল ছায়া প্রাপ্ত হয়—যেন এখান হইতে দেব-লোকে যাইবার জন্যে সকলে প্রস্তুত হইতে পারে। যাহাতে এই বোয়ালিয়া নগরে জগদীশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়, এই জন্য এখানে আমারদের আগমন। দেখ! এ কি মহান্ লক্ষ্য। যিনি "শাশ্বত-মভয়-মশোকমদেহং পূর্ণমনাদিচরাচর গেহং" তাঁর উপাসনার একটি গৃহ এই স্থানে নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি, আমরা তাঁর জগতে তাঁরই প্রীতি-পূজা স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—তিনি আমারদের এই কামনা পূর্ণ করুন। এই ব্রহ্মোপাসনা আমারদের জীবনের ফল, ব্রাহ্মসমাজ এই বঙ্গ-ভূমির অলঙ্কার। আমারদের মাতৃ-ভূমির দুর্দ্দশা চতুর্দ্দিকে নয়ন-গোচর হইতেছে—জ্বরে, দুর্ভিক্ষে, বঙ্গভূমি হাহা রব করিতেছে, কত নিরন্ন ব্যক্তি অন্নাভাবে শয়ান রহিয়াছে; কত ক্লেশের মধ্যে, দুর্ভিক্ষের মধ্যে, পাপের মধ্যে, পরাধীনতার মধ্যে, বঙ্গভূমি ক্রমাগত ক্রন্দন করিতেছে। এই দুঃখময় বঙ্গ-ভূমিতে কি আশায় জীবন ধারণ করিতেছি? একমাত্র ব্রাহ্মসমাজের আশায়। আমরা ব্রহ্মের উপর নির্ভর করিয়া আশা করিতেছি যে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া প্রতি জনের আত্মাকে উন্নত করিবে, পরিবারের মধ্যে শ্রী সমৃদ্ধি সুস্থতা বর্দ্ধন করিবে, সমাজের মধ্যে বিদ্যা বিনয় সভ্যতা বিস্তার করিবে এবং রাজ্যেতে স্বাধীনতা বিনির্ম্মুক্ত করিবে। আমারদের আশা এমনি মহতী আশা। ব্রাহ্মসমাজ আমারদের বঙ্গ-ভূমির ভূষণ, ব্রাহ্মসমাজ সকল মঙ্গলের একমাত্র প্রস্রবণ। এই ব্রহ্মোপাসনার জন্য আমারদের অন্যের উপর কিছু মাত্র নির্ভর করিতে হয়

না। ব্রহ্মোপাসনা আমারদের নিজস্ব ধন। ইহাতে অন্য জাতির হস্ত নাই, ইহাতে পরকীয় ভাবার গৌরব নাই, ইহার জন্য অপর জাতির আচার ব্যবহারের দাসত্ব করিতে হয় না। সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে যোগ, তাহাই ব্রহ্মের উপাসনা। এই ব্রহ্মোপাসনার ভাব এদেশে আধুনিক নহে। যেমন হিমালয় হইতে গঙ্গা নদী বিনির্গত হইয়া এখানে পদ্মাবতী নামে খ্যাত হইয়া সমুদ্রে সম্মিলিত হইতেছে, তেমনি পূর্ব্ব কাল হইতে ব্রহ্মোপাসনা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া এই বঙ্গ দেশে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম নাম গ্রহণ করিয়া আমারদের আত্মাকে ব্রহ্মধামে লইয়া চলিবে। পুরাতন বেদ শাস্ত্রে, প্রাচীন মনু-সংহিতাতে, পূর্ব্বকালের ভগবদ্গীতায়, এবং আধুনিক তন্ত্র শাস্ত্রেও ব্রহ্মের কীর্ত্তন ও উপাসনা নিগদিত হইতেছে। বেদে বলে "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।" পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক—সেই অন্তরতর পরমাত্মা পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। স্মৃতিতে মনু বলিয়াছেন "উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।" সেই পরব্রহ্মই উপাস্য, যাঁহাতে এই জীবাত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে "পিতাহমস্য জগতোমাতা ধাতা পিতামহঃ" আমি এই সমুদায় জগতের পিতা মাতা ধাতা এবং পিতামহ। তন্ত্রেতে আছে "সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে।" সকল ভুবনের বীজ যে ব্রহ্মচৈতন্য, তাঁহাকে ধ্যান করি। দেখ! সকল শাস্ত্রে এক-বাক্য হইয়া তাঁহাকে গান করিতেছে, যাহা ব্রহ্ম-সঙ্গীতে আমরা এই মাত্র শ্রবণ করিলাম—"ভাবো তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।" সকল শাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মের উপাসনা প্রাপ্ত হইতেছি। গঙ্গা যেমন স্রোতস্বতী হইয়া হিমালয়কে বঙ্গ দেশের সহিত যোগ করিতেছে, তেমনি সেই উত্তর পশ্চিমের ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা বঙ্গ দেশে চলিয়া আসিয়া উভয় দেশকে সমান সূত্রে গ্রথিত করিতেছে এবং সেই পুরাতন কালকে নূতন-রূপে উজ্জ্বলিত করিতেছে। কেবল কি শাস্ত্রের মধ্যেই ব্রহ্মের কীর্ত্তন আছে? আর কি কোথাও নাই? শাস্ত্রের নিতান্ত পক্ষপাতীরা যাহাকে শাস্ত্র বলিয়া মানেন না, তাহাতেও ব্রহ্মের অনন্ত মহিমার অপূর্ব্ব বর্ণনা শ্রুত হয়। নানকের গ্রন্থ দেখ। যখন পঞ্জাবের পুরাতন কালের বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বেদের যাগ-যজ্ঞ-সকল বিলুপ্ত হইল, তখনো ব্রহ্মের মহিমা তথায় লুপ্ত হইল না—তিনি আরো নূতন-রূপে উজ্জ্বল হইয়া নানকের হৃদয়ে উদিত হইলেন। গুরু নানক কেবল আপনার আত্মার বলে পঞ্জাবে ব্রহ্ম-পূজা প্রবর্ত্তিত করিলেন, সমুদয় ব্রহ্মাবর্ত্তকে ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা পুনর্ব্বার প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। তাঁহার সেই আদি গ্রন্থ জগদ্বন্ধু অনাদিকেই কীর্ত্তন করিতেছে। "আদি অনাদি অনীল অনাহত যুগ যুগ একোবেশ।" তুমি সকলের আদি, অথচ স্বয়ং অনাদি; তুমি অনীল, তুমি বর্ণ-হীন; তুমি অনাহত, তোমার মঙ্গল সংকল্পে কেহ বাধা দিতে পারে না—যুগ যুগ একোবেশ, সকল কালেই তোমার সমান ভাব। এই আদি গ্রন্থ গুরু নানকের আত্মা হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমুদয় পঞ্জাব দেশকে অমৃত-সলিলে প্লাবিত করিয়াছে; ইহা অদ্যাপি সূর্য্যোদয় অবধি রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত প্রতি দিন সঙ্গীত স্বরে অমৃতসরে অনবরত নিনাদিত হইতেছে। দেখ, যদি এক জনের সাধু ইচ্ছা হয়, ঈশ্বর তাহাতে কেমন প্রচুর ফল প্রদান করেন। এক জন দ্বারা সমুদয় পঞ্জাব দেশ পবিত্র হইল। সেই সাধু ইচ্ছার অনুকরণ কর। উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাব—দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গ-ভূমি, এক ধর্ম্ম-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। উর্ণনাভি যখন আপনার বাস-স্থান নির্ম্মাণ করে, তখন সে যেমন তাহার সূত্র এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে একে বারে সংলগ্ন করিয়া সূত্রের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ক্রমে আপনার সংকীর্ণ গৃহ নির্ম্মাণ করে; সেই প্রকার প্রথম সূত্র ব্রহ্মের আরাধনা পঞ্জাবে স্থাপিত হইয়াছিল, এখন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে ইহার অবকাশ-মধ্যে ব্রহ্ম-নাম ঘোষণা হইবে। এখন বঙ্গদেশে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য আমারদের

প্রতি জনের চেষ্টা চাই। বঙ্গদেশকে উদ্ধার যদি বঙ্গবাসীরা না করেন, তবে আর কে করিবে? আগে আপনার দেশকে উদ্ধার কর, পরে অন্য দেশের কথা ভাবিতে পারিবে। কৃষকেরা প্রথমে ক্ষেত্রকে আলি দ্বারা সীমা-বদ্ধ করে, ক্ষেত্রকে পরিমিত করিয়া তাহাকে কর্ষণ করে; সেই প্রকার আমারদেরও ধর্ম্মবীজ বপনের জন্য পরিমিত ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্তে আমাদের পক্ষে পরিমিত ক্ষেত্র এই বঙ্গ-ভূমি। এই বঙ্গ-ভূমিকে ধর্ম্ম-ফলে পুণ্য-ভূমি করিবার জন্যে আমারদের সমুদয় বল বীর্য্য ক্ষেপণ করিতে হইবে। এই বঙ্গ-ভূমিতে প্রথম স্থাপিত আদি ব্রাহ্ম-সমাজ-রূপ বৃক্ষটিকে জীবিত রাখ, প্রাণপণে তাহাকে পোষণ কর, তবে বঙ্গ-ভূমি তাহার ছায়াতে শান্তি লাভ করিবে। তাহাকে জীবিত রাখিলে তাহা হইতে শাখা-প্রশাখা-সকল বিস্তৃত হইবে এবং সেই শাখা-প্রশাখা হইতে বট বৃক্ষের ন্যায় মত্য মূল-সকল দূরাদূর-স্থিত ভিন্ন ভিন্ন ভূমিতে অবতরণ করিবে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদয় পৃথিবীর ধর্ম্ম। পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সংবাদ উদ্দীপ্ত হইতেছে। আমরা অতি দীন হীন পরাধীন, আমাদের দেশে ঈশ্বর যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন, তখন কেন না অন্য দেশে তাহা প্রদান করিবেন—কিন্তু জানি যে আমরা দীন হীন বলিয়া মাতার ন্যায় আমারদের উপর তাঁহার অধিক স্নেহ। তিনি এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এখানে প্রেরণ করিয়া আমারদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম, পৃথিবীর নানা জাতীয় ভাষা, পরিচ্ছদ, রীতি নীতি, আচার ব্যবহারের মধ্যে সকল দেশের সকল মনুষ্যকে আপনার মঙ্গল শাসনের অধীনে আনিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহ কাল ও পর কালের ধর্ম্ম—আমরা এখানে যে ব্রাহ্মধর্ম্মে অধিকারী, দেবতারা উন্নত লোকে থাকিয়া সেই ব্রাহ্মধর্ম্মেরই অধিকারী। আমরা এখানে বসিয়া যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি, দেবতারা উৎকৃষ্ট লোক-সকল হইতেও সেই ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থানেতে বদ্ধ নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম কালেতে বদ্ধ নাই। কি মর্ত্ত্য লোকে, কি স্বর্গ লোকে, কি ব্রহ্মলোকে, সর্ব্বত্র ইহার শাসন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন এক সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় ভুক্ত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম একই সম্প্রদায় এবং ইহার পরম গুরু এক ঈশ্বর। ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্ত বায়ুর ন্যায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্ত কিরণের ন্যায়—যত দূর আকাশ তত দূর ইহার মহিমা। সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক সেই মহান্ প্রভু পরব্রহ্ম। আমরা তাঁরই হস্ত হইতে অমৃত পান করিব, এই আমারদের লালসা।

হে পরমাত্মন্! যাহাতে আমরা আমারদের পাপ-মলা প্রক্ষালন করিতে পারি, যাহাতে তোমার অমৃতময় প্রেম-সুধা পান করিতে পারি, যাহাতে সদ্ভাবে সাধুভাবে তোমার উপাসনা করিতে পারি, এই উদ্দেশে এখানে একটি ব্রাহ্ম-সমাজ গৃহ পত্তন করিতে আমরা সকলে উদ্যত হইয়াছি, তুমি তাহাতে তোমার প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ বিতরণ কর। হে দেব! আমারদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমারদের এই সাধু ইচ্ছা সম্পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উপাসনা কার্য্য শেষ হইলে প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বহস্তে কর্ণিক লইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহের ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক তথায় এক খানি তাম্র ফলক সংস্থাপিত করিলেন।

বোয়ালিয়ার ব্রাহ্মগণ যে রূপ যত্ন-সহকারে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যে রূপ উৎসাহের সহিত গৃহারম্ভ ক্রিয়া সমাধা করিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর তাঁহাদিগের সেই রূপ যত্ন, আগ্রহ ও উৎসাহ চিরস্থায়ী করুন। তাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনের নিমিত্ত কুসংস্কৃত প্রতিবেশবাসীদিগের অনেকবিধ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত আপনাদের অনেক স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিবার নিমিত্ত আন্তরিক যত্ন করিতেছেন, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর তৎসমুদায় সার্থক করুন।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরের ভিত্তি-নিহিত তাম্র-ফলক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ মন্দির।

৯ই পৌষ ১৭৮৮ শক, সন ১২৭৩ সাল,

২৩ শে ডিসেম্বর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। রবি বার।

Beauleah Brahmo Somaj-Hall,

Sunday, the 23rd December 1866.

বিজ্ঞাপন

আগামী ৩১ চৈত্র শুক্র বার রাত্রি ৮ আট ঘটিকার সময়ে বর্ষ শেষ উপলক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আগামী ১ বৈশাখ শনি বার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ আট ঘটিকার সময়ে নব বর্ষ উপলক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আগামী ২ বৈশাখ রবি বার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ সাত ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহারদিগের নিকটে মাসুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গলা অক্ষরে টীকা সহিত সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য চারি আনা। যাঁহারা অন্যূন্য ১০ টাকার এই পুস্তক নগদ মূল্যে ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

ভ্রম শোধন।

এই পত্রিকার ২৩৭ পৃষ্ঠার ১ স্তম্ভের ৩০ পংক্তিতে 'ক্রিয়ায়' এই পদের পরিবর্ত্তে 'ক্রিয়ার ন্যায়' এই দুইটি পদ হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৮ শকের পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৩১
পুস্তকালয়	২৬৬৴১৫
যন্ত্রালয়	৩৫৬॥৶৫
ডাক মাসুল	৩৫॥১০
অনিরূপিত	১।৶০
গচ্ছিত	২২৭।৶০
	১২১৮৴১০

ব্যয়

মাসিক বেতন	২৯১
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৫০।৶৫
পুস্তকালয়	৬৫৸৶০
যন্ত্রালয়	৩৩৮
ডাক মাসুল	৯২।৶০
অনিরূপিত	২৮৸১০
আলোকের ব্যয়	৯৪৸১০
কাগজ পত্রাদি	৯৴০
গচ্ছিত	১৪৬৶৫
	১২৪৬।৶১০

আয়	১২১৮৴১০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৩৭৸৴৫
	১৩৫৫৸৶১৫
ব্যয়	১২৪৬।৶১০
স্থিত	১০৯॥৫

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

১৭৮৮ শকের পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের দানের বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	১২
" মহানন্দ রায়	৮
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে	৪
" হরনাথ ঠাকুর	২
" গোপালচন্দ্র পাল	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ... ..	২
" হলধর মল্লিক	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	২
" রামমোহন দে	২
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	১
" কিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী ..	১
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	১
" রাখালরাজ রায়	১
" যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু	১
" হরিদাস শ্রীমাণি	১
	৪২

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে	৬
" কাশীশ্বর মিত্র	১
" দানাধারে প্রাপ্ত	৭।০
	৫৬।০

ব্যয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর আশ্বিন নাং মাঘ ৫ মাসের বেতন	৫০

আয়	৫৬।০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৩৪॥৶০
	১৯০৸৶০
ব্যয়	৫০
স্থিত	১৪০৸৶০

শ্রী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।